ভারতের নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কারের ২৫ বছর

কৃষি-নির্ভর শ্রেণীগুলির মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা রিপোর্ট

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি

ভারতের নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কারের ২৫ বছর
কৃষি-নির্ভর শ্রেণীগুলির মধ্যে সংঘটিত
পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা রিপোর্ট

প্রথম প্রকাশ :
৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশনায় :
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি

প্রচ্ছদ :
সুশীল দাস

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা
ফোন - ২৩২ -৮৪৬৮
৯৪৩৬৫৮২৪৮৬

দাম : ৩০ টাকা

ভূমিকা

ভারতে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি ও সংস্কারের পথচলা শুরুর ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ২০১৪ সালে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয় যে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে নয়া উদারিকরণের প্রভাবে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি সমীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। সুনির্দিষ্ট স্লোগান তোলা ও গণআন্দোলন সংগঠিত ও বিকশিত করতে গিয়ে যথাযথ রণকৌশল গ্রহণের প্রয়োজনেই সমীক্ষার কাজটি করতে হবে।

২১ তম পার্টি কংগ্রেসের (এপ্রিল,২০১৫) প্রস্তুতিপর্বে পলিটব্যুরো এ কাজের জন্য তিনটি সমীক্ষক গোষ্ঠী গঠন করে। নীচের তিনটি ক্ষেত্রে সমীক্ষার জন্য তিনটি গোষ্ঠী গঠন করা হয়—

ক) কৃষি-নির্ভর শ্রেণীগুলির মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে

খ) শ্রমিকশ্রেণী ও এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ক্ষেত্রের রূপান্তর

গ) মধ্যবিত্ত জনগণ ও শহুরে জীবনযাত্রায় সংঘটিত পরিবর্তনগুলো

তিনটি সমীক্ষক দলই সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি আলোচনা করে। সেইসময় কেন্দ্রীয় কমিটি রিপোর্টগুলি গ্রহণ না করে রিপোর্টগুলিতে উল্লিখিত করণীয় কর্তব্যের কিছু অংশ ২১-তম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে ও ডিসেম্বর, ২০১৫-তে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক প্লেনামের রিপোর্টে যুক্ত করে।

উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রের ওপর নয়া উদারিকরণের প্রভাব ও সংঘটিত নানা ধরনের পরিবর্তন সম্পর্কে সমীক্ষক দলের রিপোর্টগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য পার্টি সভ্য-সমর্থক-গবেষক-গণআন্দোলনের কর্মীদের দিক থেকে একটা তাগাদা ছিল।

এই গণআগ্রহের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিতে পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা সাব-কমিটি 'দ্য মার্কসিস্ট' (সংখ্যা নং ৩২/২, এপ্রিল-জুন, ২০১৬)-এ প্রকাশিত রিপোর্টগুলি বাংলায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়।

এখন তিনটি রিপোর্ট তিনটি বই আকারে প্রকাশিত হল। রিপোর্টগুলি ভাষান্তর যারা করেছেন এবং বইগুলি প্রকাশের আনুসঙ্গিক কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। কষ্টসাধ্য এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

বইগুলির বহুল প্রচারের প্রত্যাশা করি।

(বিজন ধর)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
সি পি আই (এম)

আগরতলা
৯-২-১৭

সূচনা

১) কৃষি- সংশ্লিষ্ট শ্রেণীসমূহের উপর এবং তাদের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে তার উপর একটি রিপোর্ট প্রদান সমীক্ষক দলের বিচার্য বিষয় ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল, " উদারিকরণের নীতি চালু হওয়ার পর আর্থ- সামাজিক অবস্থায় যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তা বোঝার জন্য সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা সংগঠিত করতে হবে" — এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সমীক্ষক দল গঠিত হয়েছিল। বিচার্য বিষয়ের মধ্যে আরও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে, নয়া উদারিকরণের নীতিসমূহের প্রভাব, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ ও তাদের ভেতর পার্থক্যসমূহ বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে এই সমীক্ষা চালাতে হবে।

২) কৃষি সম্পর্কিত প্রশ্নটি শুধু একারণেই তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে, ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে (যা স্বতই গুরুত্বপূর্ণ কারণ), কিন্তু এটাও বাস্তবিক সত্য যে, ভূমি বিষয়ক প্রশ্নটি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অক্ষস্বরূপ, এবং যতদিন জনগণতান্ত্রিক স্তর বহাল থাকবে, ততদিনই এর অপরিসীম তাৎপর্য বহাল থাকবে।

৩) তৎসত্ত্বেও দু'দশকব্যাপী গ্রামাঞ্চলে দ্রুত এবং জটিল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, ঘটেছে এমন পরিবর্তন যা গ্রামীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। ভারতে, যদিও বিশ্বায়ন ও উদারিকরণের যুগের সাথে তার পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতা রয়েছে, তথাপি এটা পরিষ্কার যে, ১৯৯১ সাল থেকে গ্রামীণ- ভারতে রাষ্ট্রের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যসূচক নতুন চিত্র ফুটে উঠেছে।

৪) সাধারণভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে শাসনের পরিচয় হল,

* ভূমি সংস্কার বিপরীতমুখী করা এবং আইন তৈরি করে কৃষির জমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করা,

* কৃষিতে উৎপাদনের উপকরণ খরচ ও উৎপাদিত পণ্যের দাম নির্ধারণের নীতিতে পরিবর্তন সাধন,

* গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস করা,

* কৃষিপণ্য সংরক্ষণ এবং বিপণনে সরকারি সুবিধাসমূহকে বেসরকারিকরণের অভিমুখে ধাবিত হতে দেয়া,

* সামাজিক ও উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রভূতভাবে দুর্বল করা,

* কৃষি পণ্য বাণিজ্যিকিকরণের পথের বাধাসমূহ হ্রাস করা এবং কৃষিপণ্য আমদানির উপর পরিমাণগত বাধাসমূহ দূরীকরণ করা,

* সংরক্ষণ এবং বিপণনের সরকারি পরিকাঠামো দুর্বল করা,

* গণবণ্টন ব্যবস্থায় কোপ বসানো,

* জাতীয় উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জৈবিক সম্পদ রক্ষার প্রযুক্তিসমূহ এবং সম্প্রসারণ ও গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পদ্ধতিসমূহকে উপেক্ষা করা।

৫) সাধারণভাবে অর্থরূপী মূলধনে অপেক্ষাকৃত অবাধ প্রবেশ এবং নির্গমন হচ্ছে ১৯৯১ সাল থেকে শাসকদলীয় নীতির মূল চেহারা। নীতির মূল চেহারা হচ্ছে বাজেট ঘাটতিকে কমানোর উপর জোর দেয়া, এবং তা করা হচ্ছে প্রায় সমুদয়ভাবেই খরচ হ্রাস করার মাধ্যমে। এই নীতির বাধ্যবাধকতা বলতে বোঝায় কৃষি এবং কৃষকের উপর লাগাতর আক্রমণকে বহাল রাখা এবং তাদের প্রতি রাষ্ট্রের সহায়তা ক্রমাগত কমিয়ে আনা।

কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তি সম্পর্কিত লক্ষণসমূহ

৬) কৃষি-ভিত্তিক সম্পর্কসমূহ আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার পূর্বে আমরা উদারিকরণ কাল শুরুর পরবর্তী সময়ে উৎপাদনশক্তি বিকাশের কয়েকটি দিক সংক্ষেপে বিবৃত করব।

৭) ভিন্নতর অভিমুখী নয়া উদারিকরণজনিত সংস্কার উৎপাদনশক্তির উপর অর্থপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু তা শস্যভেদে, কালভেদে এবং অঞ্চলভেদে একই ধরনের ছিল না।

১৯৯১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ে উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির হারে পতন পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে ১৯৯৭ এবং ২০০৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই পতন তীব্র ছিল। তার মূলে কারণ এই ছিল যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সরকারি সাহায্য সরাসরি কেটে দেয়া হয়েছিল। এই ক্ষেত্রগুলি হল ফসলের সহায়ক মূল্য, ঋণ প্রদান, গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক সেবাকার্য, কৃষি সম্পর্কিত পরিকাঠামো (যেমন জলসেচ, শস্য সংগ্রহ অভিযান, সার, বীজ উৎপাদন) ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ। এ সকল ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে ফেলছে সরকার। অন্যান্য প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি হল বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া এবং প্রাথমিক শস্য মূল্য নির্ধারণে বিশ্বব্যাপী অবনমন। ২০০৪ সালের পর দেখা দেয় ভিন্ন ধরনের ঘটনা। তাহলো ২০০৪-০৫ এবং ২০০৮- ০৯ সালের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি এবং কিছু সময় পর এর পশ্চাদপসারণ।

৮। এই প্রবণতাগুলি প্রতিফলিত হয়েছে প্রধান শস্যগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে

এবং উৎপাদনশীলতায় (প্রতি ইউনিট জমিতে উৎপাদনের পরিমাণে) এবং ফার্মগুলিকে যন্ত্র-যুক্ত করার গতি বৃদ্ধিতে। প্রধান শস্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং জমির ইউনিট প্রতি ফসলের পরিমাণ তুলনা করে দেখা যায় যে, ১৯৯১ থেকে ২০১০ সালের তুলনায় ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালে এর পরিমাণ অনেক বেশি। শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৯৪ -৯৫ থেকে ২০০৪- ০৫ দশকে হয়েছে ০.৬ শতাংশ, তখন অভোজ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় বার্ষিক ০.১ শতাংশ এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার হয় বার্ষিক ০.৭ শতাংশ।

১৯৯৭-২০০৪ সময়ে কার্পাস ভিন্ন অপর প্রধান শস্যসমূহের উপকরণ ব্যবহারের বৃদ্ধির হার, উৎপাদিত ফসলের বৃদ্ধির হার এবং উৎপাদনশীলতা ছিল সর্বনিম্ন (কিন্তু ইতিবাচক)। যা হোক, ফার্মকে যন্ত্র-যুক্ত করার ফলে উৎপাদন বেড়ে যায়, এবং কার্পাস ভিন্ন কিছু শস্য, যেমন ডাল, তৈল বীজ, ফল পশারি, এদের উৎপাদন খাদ্য শস্যের চেয়ে ভাল হয়। ২০০৪-০৫ এবং ২০১১- ১২ সালের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদিকা শক্তির উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ভব ঘটে, কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে মিশ্র সঙ্কেত পাওয়া যায়।

২০০৪ সাল থেকে ঘাটতি পূরণের প্রচেষ্টা অনেকগুলো অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রথম বিষয় হল, জলসেচ। কৃষি সম্পর্কিত পরিকাঠামোর জন্য সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত কিছু শস্যের ক্ষেত্রে ভাল সহায়ক মূল্য (যদিও তা গরীব ও মাঝারি কৃষকের খরচের তুলনায় অপর্যাপ্ত) এবং তৃতীয়ত যান্ত্রিকিকরণের এবং ঋণের সুযোগ বৃদ্ধিতে উদ্দীপক প্রদান, কৃষি-সংশ্লিষ্ট জনগণের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বড় জোতদারদের, বৃহৎ ধনতান্ত্রিক জমিদারদের এবং ধনী কৃষকদের সুবিধা করে দিয়েছে এবং দেশি ও বিদেশি কর্পোরেটদের সুযোগ করে দিয়েছে।

৯। কৃষিতে উৎপাদনের পুনরুদ্ভব অধিক মাত্রায় বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, যার ফলে কৃষিতে নিযুক্ত জনগণ, প্রধানত গরীব ও মাঝারি কৃষক এবং গ্রামীণ শ্রমিকেরা নগন্য সুযোগ পেয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকন্তু এই বিশাল জনগোষ্ঠী সরকারি সহায়তার উপরই নির্ভরশীল, যাদের সাহায্যের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ২০০৯ সাল থেকে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ পূর্ণমাত্রায় হ্রাস পেয়েছে । তা পূরণের মাত্রা অতিশয় নগণ্য। কঠোর মিতব্যয়িতার নীতি শুরু হয়েছে ২০১১ সাল থেকে। দেশি ও বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির মুনাফা অর্জন বিবেচনায় রেখে উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি নিম্নগামী করা হয়, যদিও জমি মালিকানার প্রভাবশালী শ্রেণীগুলি তাদের উদ্বৃত্ত পুঞ্জীভূত করার অভ্যাস অব্যাহত রাখে এবং বিনিয়োগও করে (যা করে বুর্জোয়া জমিদারশ্রেণী সমঝোতার ভেতর দর কষাকষির ক্ষমতার সীমার মধ্যে)।

১০। এটা প্রাসঙ্গিক যে, উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধিতে প্রকৃতির তিন প্রকার প্রায়োগিক অবস্থা রয়েছে। প্রথমত, উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধি চলতে থাকে নয়া উদারিকরণের ব্যবস্থাপনার মধ্যে, এমন কি, মাঝে মাঝে থেমে থেমে তা হয়। এমনটা অনুমান করা ভুল যে, আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির দাপট উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধিকে অসম্ভব (বা প্রায় অসম্ভব) করে ফেলেছে। দ্বিতীয়ত নয়া উদারিকরণ নীতি এবং তার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মধ্যে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির বিরাট বৈষম্যের চরিত্রটি আমাদের মনে রাখা উচিত, যদিও অর্থনৈতিক বাধা আছে তা ধরে নিয়েই তা করতে হবে।

তৃতীয়ত, কৃষি-সংশ্লিষ্ট এবং গ্রামীণ জনগণের অধিকাংশের চলমান দুর্দশা, যা নয়া উদারিকরণনীতি থেকে উৎসারিত, তা যে নাটকের মত প্রতিফলিত হচ্ছে, যেমন, উদাহরণ স্বরূপ পাইকারি হারে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা, এসব বিষয় আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সময়ের মধ্যে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা ২,৭৫,০০০ এর কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে।

১১) তৃতীয়ত, নয়া উদারিকরণ জনিত বৃদ্ধি অধিকাংশ কৃষি-সংশ্লিষ্ট জনগণ এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে যে চলমান দুর্দশা সৃষ্টি করে চলেছে, তা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে।

অসম বিকাশ এবং আঞ্চলিক বিভিন্নতা

১২) কৃষিক্ষেত্রে এবং ফার্ম-বহির্ভূত গ্রামীণ অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সর্বনাশা চরিত্রের দ্রুত বিস্তার সুস্পষ্টভাবে গ্রামীণভারতে উৎপাদন সম্পর্কের প্রবণতা প্রকাশ করে দেয়। একই সাথে কৃষিভিত্তিক সম্পর্ক জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় বিভিন্নতা দ্বারা এবং উৎপাদনের ও বিনিময়ের ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশে চূড়ান্ত অসাম্যের দ্বারা চিহ্নিত। ধনতন্ত্র যে কৃষিক্ষেত্রকে এবং গ্রামীণ সমাজকে অসংখ্য প্রণালীতে বিভক্ত করে, ভারত হল তার বিশাল এবং জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

১৩) " ঘটনা থেকে সত্য উদ্‌ঘাটন" নীতিটি বুনিয়াদী মার্কসবাদ এবং তারও আগে কার কৃষি চর্চার অক্ষত নিদর্শন : যখন আমরা অর্থনৈতিক প্রবণতা, সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য কৃষির প্রবণতা চর্চা করি, তখন আমাদের বোঝাপড়া স্থানীয় শর্তাবলী দ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং কৃষির আকারের দ্বারাও পরিবর্তিত হয়। স্থানীয় সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রতি, চাষবাস এবং বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থার প্রতি, ফার্মিং পদ্ধতির প্রতি, স্থানীয় সামাজিক সম্পর্কের প্রতি, জমির বয়স সম্পর্কিত ইতিহাসের প্রতি, এবং লেনিন যাকে বলেছিলেন "scale and

type of agriculture" তার প্রতি, ব্যক্তিগত ফার্মগুলির উপর এ ধরনের উপলব্ধি আমাদের কৃষি বিষয়ক সম্পর্কটিকে অবশ্যই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। কৃষিভিত্তিক সম্পর্কের বিভিন্নতা নিছক উৎপাদন শক্তি বিকাশের স্তরের পার্থক্য নয়। বরং এই উৎপাদন শক্তি কোন কোন অঞ্চলে অন্যান্যদের চেয়ে কম বেশি অধিক পুঁজিতান্ত্রিক হয়ে রয়েছে।

কৃষিতে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্কটপূর্ণ চেহারা হল, যা লেনিন লিখেছেন, " পুঁজিতান্ত্রিক বিবর্তনের সীমাহীন ধরনের বিচিত্র সমন্বয়, এটি বা ওটি সম্ভব, যদি এই সূত্র রাশিয়া বা চীনের ক্ষেত্রে খাটে, তবে তা ভারতের ক্ষেত্রে ও কার্যকর হবে, যেখানে বংশানুক্রমিক পশ্চাদ্‌পদ ভাবাদর্শ এবং তদনুরূপ অবস্থান থেকে উদ্ভূত বস্তুতান্ত্রিক শক্তি ব্যাপনধর্মী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় এবং সেখানে সৃষ্ট 'অদ্ভুত ও জটিল' সমস্যাকে খোরাক যোগায়।"

১৪) কৃষি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মার্কসীয় সংজ্ঞার মূল বিষয় হল, কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে, বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হবে এবং এদের প্রকৃতিগত পরিচিতিও ঘটবে। এই বস্তুগত বিষয় প্রসঙ্গেও আমাদের কাজ অবশ্যই দু'প্রকার হবে : একদিকে গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠা শ্রেণীগুলিকে পৃথক করার সাধারণ তত্ত্বগত মাপকাঠি ও নমুনা প্রতিষ্ঠিত করা, অপরদিকে বিশেষ কৃষি অর্থনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতি, যা বিভিন্ন অঞ্চল ও এলাকায় বর্তমান, সে অনুসারে শ্রেণীসমূহকে শনাক্ত করা।

১৫) তিনটি প্রধান মাপকাঠি যা গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহকে পৃথকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা হল : উৎপাদনের উপায়সমূহের (বিশেষত, পুরোপুরি না হলেও, জমির) পারিবারিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ; বিভিন্ন রকম গঠনের পরিবার এবং ভাড়াটে শ্রমিকের আপেক্ষিক নিযুক্তি (বিশেষত, পুরোপুরি না হলেও, কৃষিতে উৎপাদনের প্রণালীতে), এবং সেই পরিবার এক বছরে যে উদ্বৃত্ত উপার্জনে সক্ষম সে বিষয়। অবশ্যই সাথে সাথে এখন এটা পরিষ্কার যে, কালের স্রোতে এই বিষয়গুলোর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তনের রকমভেদও বিরাট, এবং তা গ্রামের ভেতরকার ও বাইরের পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

ভূস্বামী এবং বড় ধনতান্ত্রিক কৃষক সামাজিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৬) গ্রামের শাসক শ্রেণীর ক্ষমতার প্রধান স্তম্ভ এই শ্রেণী।

১৭) ভূস্বামী পরিবারসমূহ— এখন পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক জমিদার। তাদের হাতে অধিকাংশ জমি এবং সাধারণত অধিকাংশ গ্রামভারতের উৎকৃষ্ট জমি তাদের হাতে। এই

ভূ-স্বামীর পরিবারের সদস্যগণ কৃষি কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন না। তাঁদের জমি চাষ করে হয়, সে সব ভাগচাষী যাদেরকে জমি নির্দিষ্ট ভাড়া বা শেয়ারের চুক্তিতে লীজ দেয়া হয়েছে, অথবা, ভাড়াটে কৃষি শ্রমিক গণমজুরির বিনিময়ে চাষ করে। ভূস্বামী পরিবারেরা গ্রামের একচেটিয়া জমির কারবারী, যারা সাধারণত যুগ যুগ ধরে বহাল হয়ে রয়েছে।

১৮) গ্রাম ভারতে শাসকশ্রেণীর অংশীদার হিসেবে রয়েছে তার এক দ্বিতীয় এবং নবতর শ্রেণী। বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকেরাও জমিতে নেমে চাষের কাজে কায়িকশ্রম দেন না। এই শ্রেণী এবং ভূস্বামীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তরা প্রচলিত ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত নন। তাদের কেউ কেউ ধনী কৃষক বা মাঝারি কৃষক থেকে এসেছেন, যারা পারিবারিক শ্রম জমিতে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন, এর সদস্যগণ প্রকৃতই জমিতে বেশিরভাগ কায়িক শ্রম দিয়েছেন, এমন কি, পূর্ববর্তী বংশেও তা করেছেন। এই পরিবারগুলি স্বাধীনোত্তর কৃষি এবং গ্রামীণ-নীতির সুবিধা ভোগী ছিল এবং তাঁরা স্বাধীনোত্তর কালের কৃষি পদ্ধতির যাবতীয় লাভজনক সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন। তারা কৃষি ও অন্যান্য কাজকর্ম থেকে, সুদের ব্যবসা থেকে, বেতনযুক্ত কর্মসংস্থান থেকে, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত সমস্ত উদ্বৃত্ত জমিতে বিনিয়োগ করেছেন। তাদের কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি এবং তা-ই হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি। এভাবে, যেখানে ভূস্বামীদের শ্রেণীগত অবস্থানের ভিত্তি ছিল বংশগত সম্পত্তি এবং মর্যাদা, সেখানে, বিশেষ করে সবুজ বিপ্লবের পরবর্তী যুগে, ধনতান্ত্রিক কৃষকের শ্রেণীগত অবস্থানের ভিত্তি হয় উৎপাদন শক্তির বিকাশ এবং পুঁজির পুঞ্জীভবন।

১৯) সাধারণভাবে এ ধরনের ধনতান্ত্রিক চাষীরা 'মধ্যবর্তী' বা 'ভূমি কর্ষণকারী' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত (এমন কি, প্রচলিত প্রাধান্য বিস্তারকারী সম্প্রদায়) হয়ে যায়। যদিও আচার অনুষ্ঠানগত রীতিনীতি অনুসারে তাদের অবস্থান প্রচলিত প্রাধান্যসূচক বা আচারগতভাবে 'উচ্চ' সম্প্রদায়ের সমতুল নাও হতে পারে, বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকেরা সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলে সে স্থানে উন্নীত হয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

২০) আমরা এই শ্রেণীর বৃহৎ জমির মালিকদের "বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষক" বলে অভিহিত করছি। তাদের জমি হোল্ডিং ভূস্বামীদের জমির আয়তনের একই শ্রেণীভুক্ত হয়। তাদের আয় এবং উৎপাদনের উপায়ের সার্বিক মালিকানা এবং অন্যান্য সম্পদও একই স্তরের। এই অংশটি ভূস্বামীশ্রেণীর সাথে মিশে যাবার পথে (বস্তুত মিশেই গিয়েছে)। মিশে যাওয়ার লক্ষ্য হল, তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে গ্রাম ভারতে প্রধান শোষকশ্রেণীতে পরিণত হওয়া।

ভূস্বামী এবং বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত অর্জন এবং অর্থ পুঞ্জীভবন করার

উপায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা এবং তাদের উভয়ের ঐতিহাসিক বিবর্তনে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে এখন গ্রামীণ ভারতে একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

২১) যদিও ভূস্বামীশ্রেণী এবং বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকশ্রেণীর ক্ষমতার বুনিয়াদ বা ভিত্তি হল জমির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, তথাপি তাদের দ্বারা শুধু জমিই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। এখন কি জমি একমাত্র সম্পদ বা সম্পদের প্রধান উৎসও নয়। অনেক জমিদার এবং বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষক অনেক লোভনীয় বাণিজ্যিক কাজকর্মেও জড়িত হয়ে গেছে; যেমন সুদের কারবার, শস্য চিড়ানোর মিল, দুগ্ধ প্রকল্প, খাদ্যশস্যের আগাম বাণিজ্য এবং অন্যান্য কৃষি সম্পর্কিত, ফল-পসারি সম্পর্কিত, শিল্পে উৎপাদন সম্পর্কিত, জমি বেচা কেনা সংক্রান্ত, নির্মাণ কার্য সম্বলিত, সিনেমা, থিয়েটার, পেট্রোল পাম্প, অতিথিশালা, পরিবহন, কৃষিযন্ত্রপাতি বিক্রি বা ভাড়া খাটানো, ব্যক্তিগত মালিকানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শিক্ষানৈতিক শিল্পোদ্যোগ বর্তমানে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ আয়ের এবং এই শ্রেণীগুলোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উৎস)।

অর্থনৈতিক স্থায়ী সম্পদ থেকে আয় উপার্জন এবং এ ধরনের বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত থাকা এই পরিবারগুলি রাষ্ট্রক্ষমতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে থাকে— যেমন, পঞ্চায়েতরাজ ইনস্টিটিউট এবং উচ্চতর আইনসভা, আমলাতন্ত্র এবং পুলিশ, আইনগত পেশা— সাধারণত উচ্চতর শিক্ষা এবং আধুনিক সংগঠিত সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণে তারাই থাকে প্রথম সুবিধা লাভ করে। এই শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হল গ্রামীণ এবং উপশহর এলাকায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের ভূমিকার দরুন, তাদের অবস্থান গ্রামে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান ঘাঁটি। তারা হল সেই শ্রেণী যার কাছে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের জন্য ধাবিত হয়।

২২) এই শ্রেণী গ্রামের অন্যান্যদের সরাসরি শোষণ করতে পারে নানা উপায়ে : যেমন মজুরি শোষণের মাধ্যমে, ঋণের সুদ আদায় করে এবং কৃষিপণ্য মজুত এবং বাণিজ্যের দ্বারা। জমির মালিকানায় প্রাধান্য বিস্তার ছাড়াও গ্রামস্তরে যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকে, সেগুলোর উপর এই শ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এই শ্রেণী ঋণদান এবং কৃষির উপকরণ, অবস্থাপন্নদের জন্য ভালো বিদ্যালয় স্থাপন এবং উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং সংগঠিত সেক্টরের মধ্যে কর্মসংস্থানের উপরও এই শ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে, গ্রামীণ এলাকায় সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সরবরাহের ক্ষেত্রেও এই শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব খাটায়। তা করতে গিয়ে গরীবের জন্য বরাদ্দকৃত প্রকল্পের তহবিল নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে আসে।

২৩) ভূস্বামী এবং বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকশ্রেণী শুধু অর্থনৈতিকভাবেই প্রাধান্য বিস্তার করে না, তারা গ্রাম এলাকার প্রচলিত এবং আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক যাজকতন্ত্রকে

প্রভাবিত করে। ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ বলেছিলেন, "জমিদারতন্ত্র শুধু অর্থনৈতিক সত্তাই নয়, তা সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তাও বটে।" আমাদের এই কথাটা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন।

২৪) ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামীণ ভারতে জমির মালিকানার কেন্দ্রীভবন, অন্যান্য কৃষি সম্পর্কিত সম্পদ, কৃষি ও অকৃষি উৎস থেকে সঞ্জাত আয় এবং উপার্জন ঘনীভূত হয়েছে। "'Foundation for Agrarian studies' কর্তৃক গ্রাম সমীক্ষা (অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র এই ছয়টি রাজ্যের গ্রামে সমীক্ষা) এই সঙ্কেত দিচ্ছে যে, গ্রামের সকল পরিবারের সমুদয় সম্পত্তির (জমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তির) মালিকদের উপরতলার শতকরা ৫ পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ রয়েছে মোট সম্পত্তির ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ, যার মালিকানা গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে। অপরদিকে নীচের তলার ৫০ শতাংশ পরিবারের হাতে সম্পত্তি আছে মোট সম্পত্তির শতকরা ১ থেকে ১.৫ শতাংশ।

ভূমির হোল্ডিং বণ্টনের ক্ষেত্রে অসাম্য, এমন কি মালিকানা এবং কার্যকরি হোল্ডিং, যা NSSO কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে অতি উচ্চ স্তরের অসমতা দেখা যায়, এবং প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-৬১ সাল এবং সাম্প্রতিক সময়ের তথ্যে অসমতার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ৬টি রাজ্যের ১৩টি গ্রামের মধ্যে ৯টি গ্রামের জমির হোল্ডিং অনুসারে উপরতলার ৫ শতাংশের জমির মালিকানা ৪০ থেকে ৫৪ শতাংহের মধ্যে, অপরদিকে নীচুতলার ৫০ শতাংশের কাছে জমি আছে ০ এবং ৬ শতাংশের মধ্যে। বাকি ৪টি গ্রামে, উপরের দিকে ৫ শতাংশ জমির মালিকের জমি আছে ২০ এবং ৩৫ শতাংশের মধ্যে, আর নীচু তলার ৫০ শতাংশের কাছে আছে ১০ থেকে ১৮ শতাংশ জমি।

২৫) ১৯৭০ সালের পর কৃষি জমির প্রতি এককের মূল্য অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই রকমভাবে ধনী কৃষকের প্রতি একক জমির একক পরিমাণ থেকে নীট আয় বেড়েছে।

২৬) যদিও জমিদারেরা এবং বৃহৎ পুঁজি তান্ত্রিক কৃষকেরা গ্রাম ভারতে অধিকাংশ এবং সর্বোৎকৃষ্ট জমির মালিক হয়ে থাকে, তা তারা করতে পারে উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে এবং ব্যক্তিগত বৃহৎ ফার্মের আয়তন অনুসারে। স্বাধীনতার সময়ে অথবা এমনকি ১৯৭০ সালে, যখন বৃহৎ জমিদার পরিবারগুলো শত শত, এমনকি হাজার হাজার একর জমির মালিক ছিল, তা ছিল সাধারণত অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনার নিদর্শন। দেশের বিভিন্ন অংশে বৃহৎ মালিকানার কৃষি জমির হোল্ডিং এর আয়তনে অঞ্চল ভেদে পার্থক্য আছে।

অধিকন্তু যেখানে বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক কৃষকেরা এবং জমিদারেরা একত্রে প্রধান গ্রামীণ শোষক-শ্রেণী গঠন করে, এটাও স্বীকৃত হওয়া দরকার যে, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে শোষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বসবাস করা এবং উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

২৭) জমিদার এবং বৃহৎপুঁজিতান্ত্রিক কৃষকশ্রেণীর প্রভাবশালী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। একই সময়ে যেহেতু ধনীদের আয় বাড়ানোর অনেক নতুন পথ সৃষ্টির দরুন ধনতন্ত্র এগিয়ে যাচ্ছে, (গরীবদের ব্যাপার বিপরীত দিকের প্রান্তে), জমি হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। এরকম পরিস্থিতিতে জমিদারশ্রেণীর সর্বগ্রাসী অত্যাচার এবং কৃষকদের এবং কায়িক শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের উপর সকল দিকে আগের মত প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। জমিদার এবং বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক কৃষকের উপর কৃষকও শ্রমিকের নির্ভরশীলতার মাত্রা তদনুসারে হ্রাস পেয়েছে।

২৮) কৃষক এবং শ্রমিকের উপর জমিদার এবং বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক কৃষকের গ্রাম স্তরে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক- রাজনৈতিক শোষণের মাত্রায় বিরাট আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়। গ্রামের জনগণ নানা দিক দিয়ে সর্বত্র গ্রামীণ ধনীদের কাছে দায়বদ্ধ এবং শোষক ও শোষিতের মধ্যে বহুমুখী বন্ধন বজায় রয়েছে। যা হোক গ্রাম স্তরে শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা এবং শোষণের সংযোগ নানাভাবে বদলায় : মণ্ডিয়া বা কোলাপুর জেলাগুলিতে বা বিদর্ভ অঞ্চলে কম প্রকাশ পায়, এবং আরও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায় বিহারের শ্রী গঙ্গানগর জেলা বা ভূমিহার জমিদার প্রভাবিত অঞ্চলে।

২৯) জমিদারশ্রেণীর বিলোপ সাধন কৃষক এবং গ্রামীণ শ্রমিক আন্দোলনে সাধারণ কৌশলগত দাবি। তা সত্ত্বেও জনগণের উপর এই শ্রেণীর শোষণ এবং নির্যাতন এরকম প্রত্যক্ষভাবে নানা উপায়ে ঘটে চলেছে যে, আমাদের সংগঠনগুলিকে স্থানীয় বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাবি ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিশেষত ভূমি পুনর্বণ্টন সম্পর্কিত দাবিকে মাঠে কার্যকর করার শ্লোগান এবং নির্দিষ্ট এলাকার জমির মালিকানার ধরণ এবং নিয়ন্ত্রণ বিবেচনায় এনে জমি দখলের আওয়াজ তুলতে হবে।

৩০) যেখানে জমিদার ও বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকের প্রভুত্ব এবং প্রভাব তাদের গ্রামের এবং চারি পাশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উদ্ভুত হয় (এবং একান্ত বা প্রধানত গ্রাম-ভিত্তিক শোষণ হয়), এই পরিস্থিতিতে শুধু জমির ইশ্যু নিয়ে এই শ্রেণীর

বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। জমিদারকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রশ্নে কৃষক এবং কৃষি মজুরদের সংগঠিত করা কত কঠিন তা আমাদের কিষাণ এবং কৃষি মজুর আন্দোলনের কর্মীদের কাছে খুবই পরিষ্কার। ভূমি- কেন্দ্রিক প্রশ্নটিকে এবং বিস্তারিত পরিসরে ভূমি সংস্কারের দাবির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় আমরা এটাও স্বীকার করব যে, সাধারণভাবে জমি চিহ্নিত করা, দখল করা, এবং সিলিং এর উদ্বৃত্ত জমি পুনর্বণ্টনের দাবিও আদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তার পিছনে বর্তমান সময়ের আন্দোলনের অনেক এলাকায় বিষয়গত ও বিষয়ীগত অনেক কারণ রয়েছে।

৩১) বিষয়টি পুনরায় ভেবে দেখা যাক : জমিদার এবং বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকের অর্থাৎ গ্রামীণ এলাকার উপরতলার ৫ শতাংশের স্তরের শ্রেণীগত ক্ষমতা ধ্বংস না করে আমরা জনগণের উন্নয়নের বুনিয়াদী কর্তব্য অর্জন করতে এবং শ্রেণী, জাত, লিঙ্গ এবং অন্যান্য ধরনের সামাজিক নির্যাতন এবং আর্থ- সামাজিক বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পারব না। একই সময়ে এটাও বোঝায় না যে, প্রতিটি স্থানীয় পরিস্থিতিতে (বা অধিকাংশ স্থানীয় পরিস্থিতিতে) আমরা কোন একটি গ্রামের বা এলাকার জনগণকে উপরতলার ৫ শতাংশের জমি ও সম্পদের বস্তুগত দখল নিয়ে নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করব, অথবা জমিদারকে দখলচ্যুত করার জন্য জরুরি দাবি হিসাবে আওয়াজ তুলব। সংক্ষেপে বিষয়টা এই, এ ধরণের শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই চালাব, এনিয়ে নতুন করে ভাবা প্রযোজন।

কায়িক শ্রমিক

সামাজিক- অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩২) যে সকল শ্রেণী কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, সে জনমণ্ডলীর অপর প্রান্তে রয়েছে কায়িক শ্রমিক যাদের আয়ের প্রধান অংশ আসে অন্যদের জমিতে ভাড়াটে শ্রমিক হিসাবে কাজ থেকে এবং শস্য উৎপাদনের বহির্ভূত কাজ থেকে।

৩৩) গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকেরা গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে এবং অকৃষি ক্ষেত্রে সব ধরনের কাজে শ্রম দিয়ে থাকে। একজন প্রকৃত পুরুষ শ্রমিক কাজ করতে পারে রাস্তা নির্মাণে, এন রেগাতে। এই শ্রমিক এ বছরের মধ্যেই স্থানান্তরে যেতে পারে ফার্ম এবং ফার্ম বহির্ভূত কাজের জন্য। কর্মসংস্থানে বিভিন্নতা মহিলাদের জন্য ফার্ম এবং নন্-ফার্ম কাজ পুরুষের তুলনায় কম ভিন্নতর। মহিলা শ্রমিকের পক্ষে যে সকল কায়িক শ্রম পাওয়া সম্ভব তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফার্ম বহির্ভূত কাজ হল ইটভাঙা এবং নির্মাণ কাজ (যে কাজ

মহিলাদের জন্য স্থানান্তর যোগ্য নয়, তবে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী থাকতে পারে, যা পরিবারগত কর্ম সংস্থান্য।

৩৪) গ্রাম ভারতে একজন কৃষি মজুরের কাজের ধরণকে অকৃষি মজুরের কাজ থেকে পৃথক করা এখন আর সম্ভব নয়— প্রকৃত গ্রামীণ কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিক বর্তমানে ভারতে পরিচিত হয় ফার্ম বা নন-ফার্ম শ্রমিকের চেয়ে অধিকতর " বিবিধ গ্রামীণ সামাজিক শ্রমিক হিসাবে।

৩৫) সাধারণভাবে, কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিকেরা ব্যাপক পরিসরে কাজ করে এবং গ্রামীণ বহুবিধ কাজের উপযোগী দক্ষতার সংমিশ্রণ ঘটে থাকে গ্রামের অধিকাংশ কায়িক শ্রমিকের মধ্যে। অধিকাংশ কায়িক শ্রমিকেরা হল ক্যাজুয়াল শ্রমিক, যারা দৈনিক মজুরিতে বা পিসরেটে কাজ করে। কিছু আবার কায়িক শ্রমের শ্রমিক, যেমন ফার্ম কর্মচারিরা কৃষি বিষয়ক, কৃষির বহির্ভূত বিষয়ক এবং কিছু পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় কর্তব্য করে একই কর্মকর্তার জন্য। তা করে মাসিক মজুরির মত (এবং সাধারণত বার্ষিক চুক্তিতে)।

৩৬) কায়িক শ্রমিকদের অন্য আয়ের সূত্রও থাকতে পারে। এগুলো হতে পারে পশুপালন, ক্ষুদ্রাকারে বেচাকেনা, গৃহস্থালি এবং প্রাইভেট সেক্টরে অল্প পয়সার বিবিধ কাজকর্ম।

৩৭) ঐতিহাসিক কারণে অধিকাংশ অঞ্চলে প্রধান বা বিরাট অংশের দলিত পরিবার এবং নির্দিষ্ট এলাকার অত্যাচারিত বর্ণের পরিবারসমূহ কায়িক শ্রমিকের শ্রেণীভুক্ত। তৎসত্ত্বেও, যেহেতু কায়িক শ্রমিক গ্রামীণ পেশার শেষ অবস্থা, এই কায়িক শ্রমিকেরা প্রতীয়মান হয় গ্রামীণ সমাজের সর্বাধিক নিম্নস্তরের শ্রেণী হিসেবে।

৩৮) বর্তমানে বহু কায়িক শ্রমিক ভূমিহীন, ঐতিহাসিক কারণে জমির মালিকানা থেকে অপসারণ এবং বর্তমান সময়ের উচ্ছেদের প্রক্রিয়ার ফল, এই উভয় প্রকারের উত্তরাধিকার হিসেবেই এ অবস্থা হয়েছে। কায়িক শ্রমিকেরা চাষের কাজও করতে পরে, মালিক হিসেবে অথবা ভাগচাষী হিসেবে ক্ষুদ্র খণ্ডের কৃষি জমিতে বা ঘরবাড়ির জমিতে কাজ করতে পারে, তবে এই শেষোক্ত স্তরের কৃষি কর্মি এবং দরিদ্র কৃষক, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য টানা খুবই কঠিন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হরিয়াণায় বা রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগর জেলায় এমন শ্রমিক আছে, যেমন সিরি শ্রমিক, যারা নিজেদের যুক্ত করে ভাগচাষী এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে। কায়িক শ্রমিক কি মাত্রায় ভূমিহীন হবে (গ্রামীণ সমাজে ভূমিহীনত্বের সাধারণ মাত্রা), তা অবশ্য বড় রকমে পরিবর্তিত হয়। সাধারণত কম ঘনত্বের বসতির শুষ্ক এলাকা থেকে

অপেক্ষাকৃত বেশি জলসেচযুক্ত এলাকায় কায়িক শ্রমিকদের ভূমিহীনতা বেশি (যদিও এই সাধারণ সূত্রের কৌতুহল উদ্দীপক গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমী অবস্থাও আছে)।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান

৩৯) কায়িক শ্রমিকের পরিবারগুলির উপার্জন নির্ভর করে কতদিন তাদের জন্য কাজ থাকে এবং কি পরিমাণ মজুরি তারা পায় এর উপর। আমরা যদি কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাই কৃষি মজুরদের জীবনধারার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা কর্মপ্রাপ্তির ঘাটতির পরিচয় বহন করে। সরকারের প্রদত্ত তথ্যে গ্রাম ভারতের কাজের দিনকে বাড়িয়ে বলা হয়। এই ক্ষেত্রে গ্রামগুলির প্রাথমিক সমীক্ষাই হল কাজের দিন পরিমাপের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। "ফাউন্ডেশন ফর এগ্র্যারিয়ান স্টাডিজ" সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক গ্রামসমীক্ষা জানচ্ছে যে, গ্রামীণ শ্রমিকদের কৃষি ক্ষেত্রে কাজের বার্ষিক গড়প্রাপ্তি তিন মাসের বেশি নয়। মহিলারা গড়পড়তা পুরুষদের চেয়ে কম দিন কাজ পায়। তা বছরে ৭০ দিনের বেশি নয়। এক্ষেত্রে দেশব্যাপী বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্র এই চার রাজ্যের ৯টি গ্রামের শ্রমিকের ব্যক্তি-ভিত্তিক প্রাপ্ত সমীক্ষা এ কথা বলে যে, ফার্ম এবং ফার্ম বহির্ভূত মজুরি শ্রমের মোট শ্রম দিবস অবস্থান করে পুরুষের ক্ষেত্রে ১০৫ এবং ১৮৫ দিনের মধ্যে। ১০৫ হল রেয়াসিতে (রাজস্থানের শিকার জেলায়) এবং ১৮৫ হল মাহাতোয়ারে (উত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলায়)। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই শ্রম দিবস হল ৬৫ দিন অনন্তভরমে (অন্ধ্রের গুন্টুর জেলা) এবং ১২০ দিন নিমশির গাঁও- এ (মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলা)।

৪০) রাজ্যসমূহের সিদ্ধান্তযোগ্য হস্তক্ষেপের অভাবে, বাজার শক্তিগুলি গ্রাম ভারতের শ্রম দিবসের পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি, গ্রামীণ এলাকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক যে সকল সরকারি হস্তক্ষেপের ক্ষীয়মান সুযোগ আছে, তাকেও এখন হয় দুর্বল করা হয়েছে, না হয় বিপরীতমুখী করে তোলা হয়েছে।

৪১) কৃষির ভেতর জমি চাষের নানা রকম পরিবর্তন ঘটেছে, যা শ্রমের চাহিদাকে কমিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ খাদ্য শস্যে যান্ত্রিকিকরণ চালু হওয়ার ফলে তাতে পুরুষ শ্রমিকের শ্রম গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। যে সকল শস্য চাষে আগাছা বিনাশক ঔষধ ব্যবহার চালু হয়েছে, সেখানে মহিলা শ্রমিক নিয়োগে চাহিদা হ্রাস পেয়েছে।

৪২) কৃষি সম্বলিত পরিকাঠামো নির্মাণে (জলসেচ, ইত্যাদির) সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ার ঘটনা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বন্ধ করে দিয়েছে।

জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হলে শস্যের ফসলের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং জমিগুলো বহু শ্রমধারণকারী জলসেচ যুক্ত শস্যের জমিতে উন্নীত হয়। ভূত্বকের জলে সেচ এবং ভূতলের জলে সেচ সম্প্রসারণের উপযোগী সরকারি বিনিয়োগ না হওয়ায় কর্মসংস্থান, যদি কমেও না থাকে, অন্তত একটা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে আছে।

৪৩) কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে যথার্থ সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিই হল গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় শর্ত।

৪৪) গ্রামীণ এলাকায় অকৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ অপর্যাপ্ত, বিভিন্নতার দিক থেকে এবং দক্ষতা ধারণের ক্ষেত্রে দুর্বল। অকৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের প্রাপ্যতা সর্বদাই মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের বেশি।

৪৫) গ্রামীণ এলাকার কর্মসংস্থানে ধীর গতির ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষি শ্রমিক পরিবারের উর্দ্ধ গতির সম্ভাবনা, বিশেষ করে দলিত এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে, অত্যন্ত সীমিত রয়েছে। গ্রাম থেকে শহর এলাকায় বা মহানগরগুলিতে নানা ধরনের স্থানান্তর গমনের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি এই উভয়ক্ষেত্রের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা তার কারণ।

৪৬) কৃষকের সর্বহারা শ্রেণীতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া এবং কায়িক শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সঙ্কট গ্রাম ভারতে মহিলাদের কাজের তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্পষ্ট অভিক্ষেপণ।

৪৭) বর্তমানে শ্রমের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভেদের দ্বারা মহিলাদের কাজের প্রাপ্যতা মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং মহিলাদের কাজের বিভিন্নতা পুরুষের চেয়ে কম। সাধারণভাবে মহিলাদের কাজের শ্রমদিবসের সংখ্যা সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং পুরুষের শ্রমদিবসের সংখ্যার চেয়ে বাস্তব অর্থেই কম। গ্রামীণ কর্মসংস্থানে মন্দা এবং তুলনামূলকভাবে অধিকাংশ শস্যের (ব্যতিক্রম হল কার্পাস চাষ) চাষের জন্য শ্রমের চাহিদায় ঘাটতি মহিলাদেরকে পুরুষের তুলনায় অধিক ক্ষতি করেছে। ফার্ম বহির্ভূত শ্রমিকদের বহুবিধ সুযোগের অনুপস্থিতিও মানুষের তুলনায় মহিলা শ্রমিকের অধিকতর ক্ষতি করেছে।

৪৮) যেমন গ্রাম্য জীবনের অন্যান্য দিকের মত মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট গতিধারা কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষি বাস্তুতন্ত্র নির্বিশেষে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।

৪৯) সাম্প্রতিককালে কিছু এলাকায় পুরুষের জন্যও ফার্ম বহির্ভূত চাকুরিসহ এমন কর্মসংস্থানের হদিশ পাওয়া গেছে যাতে স্থানান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তাতে মহিলা ও তার সন্তান সন্ততিদের নিয়ে কৃষকের ফার্মে গোটা পরিবারই ক্রীতদাসের মত আবদ্ধ থাকতে

এবং গ্রামীণ এলাকায় মজুরি শ্রম দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি গ্রাম সমীক্ষা চালিয়ে বিহারের পশ্চিম চাম্পারণ জেলায় এবং রাজস্থানের শিকারীতে তা দেখা গেছে)। এসব এলাকায় শ্রমশক্তিকে মহিলা শ্রমে পরিণত করা হচ্ছে বহুবিধভাবে: মহিলা শ্রমিকরা গোটা শ্রমশক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, এবং কায়িক শ্রমদানকারী মহিলারা অন্য মহিলা শ্রমিকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অন্যান্য এলাকার অভিজ্ঞতা এই যে, যান্ত্রিকিকরণের অগ্রগতি বেশি বেশি করে সময়ের হারে কর্তব্য পালনের প্রশ্ন এনে দিয়েছে এবং তা পীস রেইটের কাজে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পীস রেইট অনুসারে মজুরির হিসেব হচ্ছে। শস্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে বিরাট শ্রমিকের দল দিয়ে যেখানে পুরুষের প্রাধান্য আছে। পুরুষ কন্ট্রাক্ট শ্রমিকেরা সে সকল কাজও হাত করে ফেলে যা আগে মহিলারা করত।

৫০) গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বকীয় নীতিভিত্তিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিত হল, গ্রামটা অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অথবা খরাপ্রবণ কিনা, সরকারি অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যযুক্ত স্কিম নিয়ে উন্নত কিনা, তাতে ব্যাপক পরিসরে উৎপাদন সম্পর্কিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে কিনা, জমি ফার্ম বিশিষ্ট, না ফার্মের বাইরে? এগুলি বিচার্য। যদি দীর্ঘসময়ব্যাপী কর্মহীনতা এক বছরের কাজের মধ্যে পূরণ করতে হয়, তবে এসব অনুসন্ধান জরুরি।

৫১) গ্রামীণ এলাকায় সরকারের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম একটি অগ্রগতির পরিচালক, কিন্তু তা গ্রাম এলাকার কর্মসংস্থানের সংকট অবসানে যথোপযুক্ত নয়। এই প্যারাগ্রাফে এবং পরবর্তীটাতে আমরা মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুর‍্যাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম (এম জি এন আর ই জি এস) এর বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো অবলোকন করব। প্রথমত, এম জি এন আর ই জি এস প্রোগ্রামগুলি গ্রামের জমিদার এবং ধনী কৃষক অংশের আক্রমণের টার্গেট। অনেক রাজ্যে এম জি এন আর ই জি এস প্রকল্পের জন্য যে মজুরি ধার্য করা হয়েছে, তা সে রাজ্যে চলতি ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম। তথাপি স্থানীয় জমিদার ও ধনী কৃষকেরা সরকারকে রেগার মজুরি বৃদ্ধি না করতে যেভাবে চাপ দিচ্ছে, সরকার সেই চাপের কাছে নতি স্বীকার করছে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের সংরক্ষণমূলক আর্থিক ভঙ্গিমা স্কীমের উদ্দেশ্যকে লঘু করে দিতে সাহায্য করছে। এম জি এন আর ই জি এস -এ বছরের পর বছর বাজেট বরাদ্দ প্রকৃত অর্থে কমে যাচ্ছে।

সারা দেশে মজুরির জন্য যে অর্থ বরাদ্দ ছিল, তার মধ্যে ২০১৪ সালের জুলাই মাসে ৪,৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়নি। এম জি এন আর ই জি এস-এ রেজিস্ট্রিকৃত পরিবারগুলির কাজের শ্রম দিবস ২০১০-১১ সালে গড়ে ৪৩ দিন এবং ২০১৩-১৪ সালে তা হয়েছিল

গড়ে ৪৬ দিন। তৃতীয়ত, এম জি এন আর ই জি এস কর্মসূচি অনুসারে কর্মসংস্থান গ্যারান্টির যে আইনগত ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে দুর্বল করার জন্য খোদ শাসক দলের পক্ষ থেকেই (উদাহরণস্বরূপ রাজস্থান মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে) দাবি তোলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই আইনকে শুধুমাত্র একটি স্কিম বলে উল্লেখ করা হোক। আরও সাম্প্রতিক রিপোর্ট পরামর্শ দিচ্ছে যে, সরকার এই প্রোগ্রামটি কতিপয় নির্বাচিত ব্লকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, যা বস্তুত রেগা আইনটিকে অমান্য করার সামিল হবে।

৫২) এম জি এন আর ই জি এস প্রোগ্রামকে শক্তিশালী করতে বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ প্রতিটি শ্রমিকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য (অর্থাৎ পরিবার নয়, প্রতিটি শ্রমিকের নিকট), মজুরি প্রদান, বিলম্বিত পেমেন্টের জন্য ক্ষতিপূরণ চালু করা, বকেয়া মজুরি প্রদানের জন্য তহবিল আদায় করা ইত্যাদি দাবি আদায়ের জন্য আমাদের সংগঠনকে উদ্যোগ নিতে হবে। জীবিকার মান উন্নয়ণের জন্য প্রকল্পটিকে আরও যথার্থভাবে কার্যকর করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে যেন মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে সঙ্গতি রেখে মজুরি স্থির করতে এবং মজুরির হারকে নিয়মিত পরিবর্তিত করতে হয়; এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, মজুরি কোন অবস্থায়ই রাজ্য সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির নীচে যেন নেমে না পড়ে।

গ্রামীণ মজুরি হার

৫৩) চারটি প্রধান মজুরি হার রয়েছে গ্রামীণ ভারতে। প্রথমত, গ্রাম ভারতে মজুরির হার, সঠিক অর্থে, নীচু। একটি সহজ গণনা দ্বারা তা প্রদর্শন করা যায়। ১৭ টি গ্রামের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ পাঁচজনের পরিবার (একজন পুরুষ শ্রমিক, একজন মহিলা শ্রমিক এবং তিনজন নির্ভরশীল, দৈনিক এক ডলার, অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার সমতুল উপার্জনের জন্য বর্তমানের বহাল থাকা মজুরিতে ৬০০ দিনের অধিক শ্রমদিবসের কর্মসংস্থান প্রয়োজন। বর্ণনাক্রমে, উত্তরপ্রদেশের বিজনোর জেলার হারেভলি গ্রামে বর্তমান মজুরিহারে দুই শ্রমিকের একটি পরিবারের জন্য ৬২৬ শ্রমদিবস কর্মসংস্থান প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায়, যদি মজুরি না বাড়ে তবে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা কায়িক শ্রমের পরিবার বছরে ৩০০ দিনের কাজ পেলে দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করতে পারবে। এ সংখ্যা অর্জন স্পষ্টতই অসম্ভব।

প্রথমত, এই স্তরের কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, এবং তারা ক্রীতদাসের স্তরের কর্মসংস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং কঠোর শ্রম দিয়েও এ অবস্থাকে মোকাবিলা করা অসম্ভব। গণনাতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, যদি এম জি এন আর ই জি পি এস ১০০ দিনের কাজের

ব্যবস্থাও করে, তাতেও দারিদ্র্যসীমার স্তরে উপার্জন তুলে আনার জন্য বিরাট সংখ্যক গ্রামীণ শ্রমপ্রদানকারী পরিবারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়ত, মজুরি হারে অঞ্চলগত নানারকম বৈষম্যজনিত বিশিষ্টতা রয়েছে। একটি চরম স্তরে, দৈনিক মজুরি হার পুরুষের ক্ষেত্রে কেরালায় বর্তমানে ৬০০-৬৫০ টাকা (এই দৃষ্টান্ত এসেছে দৈনিক হারে নগদে কাজ করার প্রধান এলাকা থেকে)। ফাউন্ডেশন ফর এগ্র্যারিয়ান স্টাডিজ যে ২০ টি গ্রাম সার্ভে করেছে তাতে পুরুষের মজুরি হার (২০১২ এর ডিসেম্বরে হারকে অপরিবর্তিত ধরে গড়িয়েছে গোয়ালিয়র জেলার ঘরসোন্দি গ্রামে নিম্নতম হার দৈনিক ৮২ টাকা থেকে শিকারি জেলার রেয়াসি গ্রামের দৈনিক মজুরি ১৯৫ টাকা (যা পরিযায়ী উচ্চ ধরনের শ্রমিকের মজুরি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিম্নতম দৈনিক মজুরি হার ২০১২ সালের গ্রীষ্মে নিম্নতম ৩০ টাকা ছিল বিহারের পশ্চিম চাম্পারণ জেলার কাটকুইয়ান গ্রামে।

তৃতীয়ত, মজুরি হারে বড় ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়। কাটকুইয়ানে মহিলাদের মজুরি হার পুরুষের মজুরি হারের মাত্র ৩০ শতাংশ, গুন্টুর জেলার অনন্তভরম গ্রামে ৪০ শতাংশ অধিকাংশ গ্রামে মহিলাদের মজুরি পুরুষের মজুরির ৫০ শতাংশ, যদিও কিছু গ্রামে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত এই অনুপাত উঠে এসেছে। তবে শিকারি জেলার রেয়াসি গ্রামে কিছু ব্যতিক্রম নজির আছে। সেখানে পুরুষ শ্রমিকরা স্থানান্তরে কাজের জন্য চলে যাওয়ায় মহিলাদের মজুরি পুরুষের মজুরির প্রায় সমানস্তরে উঠে আসে।

চতুর্থত, মজুরির অংশ হিসেবে বিনিময়ে দ্রব্য দেওয়া (শস্য প্রদান এবং রান্না করা খাদ্যকে মজুরির অংশ হিসেবে ধরা, এরূপ দৃষ্টান্ত), যা মোট মজুরির অংশ; তবে তা দেশের অধিকাংশ স্থান থেকে উঠে গেছে। দ্রব্য দিয়ে মজুরি দেবার রীতি এখন আর চালু নেই, বা থাকলেও তা কোন কোন এলাকায় একেবারে নগণ্য।

৫৪) ওয়েজ রেটস ইন রুর‍্যাল ইন্ডিয়া (ডব্লিউ আর আর আই)-এর সরকারি তথ্যমালা বোঝায় যে, সাম্প্রতিক অতীতে মজুরি হার বেড়েছে। বিশেষত ২০০৪-০৫ সালে থেকে পরবর্তী সময়ে। WRRI হল রাজ্যস্তরে ১১ টি ফার্ম এবং ৭ টি অকৃষি ফার্ম অপারেশনের তথ্য প্রদানের উৎস। এই তথ্য অনুসারে অদক্ষ পুরুষ শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২ সালের মধ্যে ৪ শতাংশ হারে। মজুরি সবচেয়ে দ্রুত হারে বেড়েছে ২০১১-১২ সালের মধ্যে। এ সময়ে অদক্ষ পুরুষ শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে বছরে ৭.৬ শতাংশ। মহিলা শ্রমিকের মজুরিও ২০০৪-০৫ সালের পর এবং তা পুরুষের তুলনায়

অধিক দ্রুত হারে বেড়েছে। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, আগাছা বাছাইয়ের জন্য মজুরির হার (যা সামগ্রিকভাবে মহিলাদেরই কাজ) বেড়েছে বছরে ৬ শতাংশ, ২০০৪-০৫ এবং ২০১১-১২ সালের মধ্যে। গ্রাম ভারতে পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকদের মজুরির হারের সাম্প্রতিক বৃদ্ধিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচার করতে হবে, অর্থাৎ তাকে দেখতে হবে, অচল হয়ে থাকা দীর্ঘ অবকাশের পরিপ্রেক্ষিতে— এমনকি সরকারি তথ্য অনুসারেও— গ্রামীণ মজুরির ক্ষেত্রে। সর্বভারতীয় স্তরে, মহিলাদের মজুরিতে কোন পরিবর্তন নেই এবং ১৯৯৯-২০০০ এবং এবং ২০০৪-০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পুরুষের মজুরি হারের বৃদ্ধি অতি সামান্য।

সংগঠনের প্রশ্ন

৫৫) আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, গ্রামীণ কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিকেরা নানা প্রকারের কাজে নিযুক্ত থাকে এবং তারা প্রাথমিকভাবে কৃষি কাজেই মজুরি শ্রম দিচ্ছে আর এরকম মনে করা যায় না। গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কম বেশি পুরোপুরি গড়ে উঠা শহরের সর্বহারাদের থেকে পৃথক। প্রথমত, প্রায় সকল গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকেরা বিভিন্ন মাত্রায় নানাভাবে কৃষি মজুরের কাজে অংশ নিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকদের কাজের তালিকায় গ্রাম বা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক আকারের অসম কাজের খতিয়ান থাকে। তৃতীয়ত, গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকদের স্থানীয় শ্রমের বাজারে যারা কাজ দিয়ে থাকেন, তারা হলেন গ্রামের শোষকশ্রেণী।

৫৬) শ্রমিকরা কখন কে কি কাজ করছে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে কিছু সাধারণ দাবির ভিত্তিতে দাবিসনদ তৈরি করার বিষয়টি এখন হয়তো ভাববার সময় হয়েছে। এই দাবিসমূহ অবশ্যই বিভিন্ন পেশার ন্যূনতম মজুরি হারের সাথে সম্পর্কিত হবে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজের নমুনা ও শর্তাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। দাবি উত্থাপন করতে হবে গ্যারান্টিযুক্ত শ্রমদিবসের সংখ্যার উপর সার্বজনীন, স্বাধীন এবং আবশ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য, সুষ্ঠুস্তরের স্বাস্থ্য পরিসেবা, আবাসন, পানীয় জল, শৌচাগার এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে। এ কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য হাতিয়ার বা সংগঠন হল "গ্রামীণ শ্রমিক ইউনিয়ন"। সুনির্দিষ্ট সংগঠন এবং তার প্রকৃতি নমনীয় হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে, তা বিবেচনা করতে হবে যা রাজ্যে রাজ্যে ভিন্ন হবে।

কৃষক সম্প্রদায়

৫৭) যে কৃষকেরা সকল প্রকার কাজে অথবা প্রধান কায়িক শ্রমের অনেকগুলিতেই অংশগ্রহণ করে থাকে, তাদের পরিবারগুলি নিয়ে তৈরি হয় ক্ষুদ্র উৎপাদক গোষ্ঠী, যাদের

শ্রেণীগত অবস্থান হল একদিকে জমিদারি এবং বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকের মাঝামাঝি অবস্থায়, অন্যদিকে তারা হবে কায়িক শ্রমিক। একটি সামাজিক শ্রেণী হিসেবে কৃষক সমাজ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপতকার পরিচয় দিয়েছে। তারা অবিরাম চলমান নানারকম ঐতিহাসিক সামাজিক বিবর্তনমূলক ঘটনাবলির মধ্যেও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, আধুনিক কৃষকের বৈশিষ্ট্য হল দেশি-বিদেশি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা।

৫৮) কাউকে সুখী করা (এবং যে কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা)-র উপযোগী কৃষক সমাজের রূপটি সমভাবাপন্ন একটি গ্রামীণ গোষ্ঠীর মত। তবে মার্কসবাদ কৃষক সম্পর্কে বলেছে, তারা নয় সমস্বত্ত্ব কোন শ্রেণী, না তারা গঠন করে একটিমাত্র শ্রেণী; পক্ষান্তরে তাদের বৈশিষ্ট্য হল নানা প্রকারের বিভিন্নতা, এবং তারা বিভক্ত হয়েছে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীতে। কৃষকের ভেতর শ্রেণী বিভাজন বিশ্লেষণ এবং কৃষক জনগোষ্ঠীতে বিরাজমান শ্রেণীগুলিকে পৃথকীকরণের মাপকাঠিতে নির্ধারণ বিশেষভাবে একটি মার্কসীয় চর্চার বিষয়— অন্য কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবনা এ বিষয়কে তত্ত্বগতভাবে কেন্দ্রীভূত করে না এবং প্রয়োগের দিকে চালিত করে না।

৫৯) কৃষকের মধ্যে বিরাজমান শ্রেণীগুলিকে পৃথকিকরণের প্রধান মাপকাঠিসমূহের মধ্যে রয়েছে—

* উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং অন্যান্য সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ,

* একদিকে পরিবারের শ্রমের মোট শ্রম দিবসের সংখ্যা, এই সংখ্যার মধ্যে কি পরিমাণ শ্রমদিবস কৃষি এবং অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যদিকে কত শ্রমদিবস ভাড়া করা হয়েছে, এর অনুপাত,

* ভাড়া শোষণ, অর্থাৎ পরিবার কর্তৃক ভাড়া গ্রহণ বা ভাড়া প্রদান।

* পরিবারের সর্বশুদ্ধ আয়, পরিবারের কৃষিতে উৎপাদনের মোট মূল্য এবং প্রতি হেক্টরে কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং

* পরিবারের আয়ের উৎস।

৬০) যে জমি ব্যবহার করা হচ্ছে তার প্রকৃতি এবং প্রতি মাসের শস্যের নমুনা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে কৃষক পরিবারের সদস্য শ্রমিকের শ্রমক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাত্রা। প্রতিটি গ্রামেই শস্যের নমুনা এবং প্রযুক্তিগত পদ্ধতি এমন যে, শস্য প্রতি শ্রম আত্মিকরণের যথার্থ পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য রয়েছে পারিবারিক শ্রম, বিনিময় শ্রম (যদি এরকম প্রচলিত থাকে) নানা প্রকার ভাড়া শ্রমের আপেক্ষিক অনুপাতেও। বিশেষত, ভারতে জলযুক্ত জমিতে ধান চাষ এবং আরও কিছু ফসলের চাষের বিশেষত্ব এই যে, সকল

অংশের কৃষককেই ভাড়া করা শ্রম নিযুক্ত করতে হয়।

শ্রম নিযুক্তির নমুনাতে বর্ণ ও ধর্মীয় সম্প্রদায় ভেদে পার্থক্য থাকে এবং প্রচলিত লিঙ্গভেদের ভূমিকাও বিদ্যমান, বিশেষত বিভিন্ন জাতের মধ্যে। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যেহেতু (i) কৃষিতে যান্ত্রিকিকরণ এগিয়ে চলেছে, এবং তা ক্রমে অধিক সংখ্যক শস্যে জড়িয়ে পড়ছে, বা (ii) কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে পেশাগত বিভিন্নতা বেড়ে চলেছে, বা (iii) কৃষি কাজটাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে গেছে বা বিশেষ দক্ষতার উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, সেহেতু কৃষকশ্রেণীগুলির মধ্যে কারা শ্রম দেয় বা দেয় না এ পার্থক্য নিরূপণ কঠিন হয়ে গেছে।

৬১) ধনী কৃষক পরিবারগুলি উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানার উচ্চস্তরে রয়েছে, বিশেষ করে জমি এবং অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রীর বিচারে, যেখানে চিত্রের অপর দিকের শেষপ্রান্তে রয়েছে গরিব কৃষকের হাতে ছোট ছোট জমির খণ্ডাংশ ছাড়া কচিৎ অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ।

৬২) অনুরূপভাবে আয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে উঁচু স্তরের উদ্বৃত্ত থেকে ন্যূনতম বেঁচে থাকার সঙ্গতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি গরিবের ক্ষেত্রে আয় নেতিবাচকও হয়ে পড়ে।

৬৩) সাধারণভাবে, সেই কৃষকদের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। ধনী কৃষক, যারা প্রচলিত গুরুভার করের দ্বারা জমিদারদের কাছে ঋণগ্রস্ত, তারা গরিব কৃষকের এবং শ্রমিকের লড়াইয়ের শক্তিধর সঙ্গী হত, এখন এ ঘটনা কমছে। অন্যভাবে বলা যায়, জমিদার ও বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকদের সঙ্গে ধনী কৃষকের দ্বন্দ্ব ১৯৭০ দশক পর্যন্ত যেমন ছিল তার তুলনার ভোঁতা হয়ে গেছে।

সমসাময়িক কালের প্রজাস্বত্ব

৬৪) প্রজাস্বত্ব ভোগের উপর সরকারি তথ্য মারাত্মক ভুল। কারণ তারা অঘোষিত প্রজাস্বত্বকে যে কোন অর্থপূর্ণ উপায়ে ধর্তব্যের মধ্যে রাখেনি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে গ্রামীণ ভারতের মাত্র ৬.৫ শতাংশ কার্যকর পারিবারিক হোল্ডিং বণ্টন করা হয়েছে। অপরদিকে সার্ভের তথ্য থেকে দেখা যায়, যেখানে প্রজাস্বত্ব বণ্টনে অনেক পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন এলাকাজুড়ে, মোটের উপর তা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস্তবোচিত করা যায়।

৬৫) বামপন্থী সরকার যে সকল রাজ্যে রয়েছে, সেসব রাজ্য বাদে স্বত্বাধিকারীদের জমি অরেজিস্ট্রিকৃত রয়েছে। এগুলি রয়েছে মৌখিক ও স্বল্পমেয়াদি অধিকার হিসেবে।

৬৬) সারা দেশেই এই স্বত্ব দানে রয়েছে বড় রকমের বিভিন্নতা এবং জটিলতা। শস্যের নমুনা এবং প্রযুক্তি পরিবর্তনের ফলে প্রজাস্বত্ত্বের গঠন বদল হয়েছে এবং অনেক এলাকায় নতুন ব্যবস্থা আবির্ভূত হয়েছে।

৬৭) কিছু তীব্র শোষণ- প্রবণ স্বত্ব কাঠামো টিকে আছে এবং নির্দিষ্ট কিছু গ্রামে তা পুঞ্জীভূত হয়েছে, যেখানে কৃষির বৈশিষ্ট্য হল প্রভূত উৎপাদনশীলতা, যান্ত্রিকিকরণ এবং সেখানে সাধারণভাবে উৎপাদন শক্তি বিশাল উঁচু মানে পৌঁছেছে। এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত হল, অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ সমুদ্র উপকুলবর্তী ধান উৎপাদনের অঞ্চল, হরিয়াণা এবং রাজস্থানের বিভিন্ন অংশে সিরি (siri) চাষ, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিজনোর জেলার দলিত গরিব চাষিদের ঋতুভিত্তিক স্বত্বাধীন এলাকা। হরিয়ানার যান্ত্রিকিকরণের বিশিষ্ট পদ্ধতি শুরুর সঙ্গে ভাড়া বৃদ্ধিটা যুক্ত হয়ে গেছে। ভূস্বামীরা যখন নলকূপ থেকে জল সরবরাহ শুরু করেন, বা মাঠ তৈরির জন্য ট্রাক্টর ব্যবহার শুরু করেন, তখনই তাঁরা ভাড়া বৃদ্ধিও শুরু করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ধান জমির ভাড়া বৃদ্ধি পায় উৎপাদনশীলতা অনুসারে। প্রকৃতপক্ষে গুন্টুর জেলার অনন্তভরম গ্রামে কমরেড পি সুন্দরাইয়া যে চর্চা করেছিলেন তার সাথে সাম্প্রতিক সমীক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই শিক্ষা দেয় যে, ১৯৭৪ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে ধানের উৎপাদনশীলতার যে বৃদ্ধি ঘটেছে তার প্রায় সমুদয় ভাগই ভূস্বামীরা ভাড়ার নামে কব্জা করে ফেলেছেন।

৬৮) কিছু এলাকায় লীজ কন্ট্রাক্টগুলি প্রজাস্বত্বের নমুনার সাথে ভাড়া শ্রমে আবদ্ধ অবস্থাকে যুক্ত করে দেয়। আমরা উপরে সিরি (siri) শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করেছি। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিজনোর জেলার আখ উৎপাদনের এলাকা থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, যেখানে ভূস্বামীরা আখ তুলে নেবার পর ফার্মসেবকদের ছোট ছোট প্লট করে ধান চাষের জন্য লীজ দেয়।

৬৯) যদিও ছোট এবং বড় উভয় প্রকারের ভূস্বামীগণ ভূমিস্বত্ব বেচাকেনার বাজারে লীজদাতা বা লীজগ্রহীতা হিসেবে অংশগ্রহণ করে, সেখানে যে চুক্তির বলে বিভিন্ন শ্রেণীর এবং সামাজিক গ্রুপগুলি জমি পেয়ে থাকে, সে চুক্তিগুলির মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য থাকে। সাধারণভাবে, দলিত, ভূমিহীন এবং গরিব কৃষক পরিবারগুলি জমি লাভ করে উচ্চহারের ভাড়ার বিনিময়ে, যা প্রায়ই বহণ করা দুঃসাধ্য হয়। এ সকল স্বত্বের চুক্তি কর্মসংস্থান এবং ঋণ লেনদেনের সাথে সংযুক্ত থাকে। অন্যদিকে ধনীরা লীজ নেয় অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে। তা নেয়া হয় এমন লোকদের কাছ থেকে যারা এলাকার বাসিন্দা নয়, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজন বা ছোট জমির মালিক। এটা হচ্ছে সাধারণ লীজের (বা বর্গার) উল্টো প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, এ

ঘটনা হল এমন: ক্ষুদ্র, দরিদ্র জমির মালিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সুযোগ নিতে পারে না, কারণ উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক তারা নন, এবং বিনিয়োগ করার মত অর্থাৎ এদের নেই। সরকারি পরিষেবার ঘাটতির জন্য— যেমন, পুরানো খাল নির্ভর সেচের এলাকায় সরকারি খরচে জলসেচ ব্যবস্থা না থাকা; এবং তার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার টিউবওয়েলগুলির উপর নির্ভরশীলতা, এগুলো ক্ষুদ্র মালিকদের বাধ্য করছে বড়দের হাতে লীজের নামে জমি তুলে দিতে।

কৃষকের আয়

৭০) নতুন কাজ কারবারের শাসন চালু হওয়ায়, এক নতুন এবং নজিরবিহীনভাবে কৃষিকে খাদ্য শস্য এবং অভোজ্য শস্যের আন্তর্জাতিক দরদামের উবে যাওয়ার মুখে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে সোজাসুজি মূল্যহ্রাসের দীর্ঘস্থায়ী এক ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হল আমদানি এবং রপ্তানির জন্য কৃষি পণ্যের অত্যন্ত ব্যাপক পরিসরে পরিমাণগত বাধা তুলে দেয়া, তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গম এবং গমজাত দ্রব্য, চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, অন্যান্য শস্য বীজ, এবং আমদানি শুল্কের উপর যথেচ্ছ পরিমাণে ছাড় দেওয়ার বিষয়। কৃষিপণ্যের রপ্তানিতে উদ্দীপনা এবং সহায়তা অবধারিতভাবে জমি ব্যবহার এবং শস্যায়নের রকমারি পরিবর্তনকে প্রভাবিত করবে। একইভাবে পুরানো ব্যবস্থাদি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে, প্রাইভেট এজেন্সিকে অনুমোদন দেবে এবং উৎসাহিত করবে।

৭১) উদারিকরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আবির্ভূত হল; অন্তর্দেশীয় এবং বহু জাতিক, উভয় প্রকারের বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির নজিরবিহীন হস্তক্ষেপের কাণ্ড কারখানা। তা ঘটল কৃষিতে সামগ্রী সরবরাহের সুযোগ নিয়ে, যার মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার সার, বীজ এবং কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

৭২) বেশিরভাগ রাজ্যে অধিকাংশ ফসল উৎপাদন করতে মাঝারি এবং দরিদ্র কৃষক প্রতি ইউনিট শস্যের জন্য যা খরচ করেন এবং ন্যাশনাল ফার্মার্স কমিশন যা প্রস্তাব করেছেন, সেই অনুসারে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রকৃত উৎপাদন খরচকে পূরণ করে না এবং কোথাও কমিশনের প্রস্তাবের ধারে কাছেও নেই। পরন্তু ফসল সংগ্রহের সরকারি ব্যবস্থাপনা ক্রমে দুর্বল হওয়ার দরুণ এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দেশের অধিকাংশ স্থানে গরিব ও মাঝারি কৃষকেরা এই সহায়ক মূল্যের কোন সুবিধা পাচ্ছেন না এবং তাদের বৃহৎ অংশ প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁদের শস্য ক্ষতিকর দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। উদারিকরণের নীতি সরকারি সংগ্রহকে নীচের দিকে নামিয়ে

দিচ্ছে এবং দামে সহায়তা দেবার জন্য সরকার যে শস্য বাক্স নির্ধারণ করে তাকে আরও ছোট করে দেয়।

৭৩) এই নীতিসমূহের প্রভাবে অঞ্চল, শস্য এবং শ্রেণীভেদে বড় রকমের পার্থক্য বিরাজ করছে। যখন কৃষক পরিবারসমূহের বড় অংশ উপার্জন করে সামান্য আয়, তখন ভূস্বামী, বৃহৎ পুঁজিবাদী কৃষক এবং ধনী কৃষকের আয়ের পরিমাণ হয় যথেষ্ট।

৭৪) গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এমন বিষয় বোঝায়, যা মাত্রায় এবং পরিসরে নতুন, এবং কৃষকের ভবিষ্যতের উপর তীব্র যার কার্যকারিতা আছে: তথ্যের তালিকা দেখিয়েছে যে, একটি নতুন স্তরের পরিবারবর্গ (প্রধানত গরিব কৃষক) -র ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে শস্য থেকে নেতিবাচক আয় আসে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা অনুসারে চাষের খরচের উপর ইউনিট স্তর থেকে লব্ধ তালিকা পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক চর্চা অনুসারেও দেখা যায় — একটি স্তর থেকে শস্য চাষের আয় নেতিবাচক।

৭৫) কৃষি থেকে প্রাপ্ত আয়ে কৃষকদের পরিবারের নানা স্তরে বিরাট পরিমাণে পার্থক্য রয়েছে, শুধু এটাই ঘটনা নয়। তালিকাগুলি থেকে এটাও বোঝা যায় যে, কৃষির খরচের ক্ষেত্রে এবং লাভের ক্ষেত্রেও বড় রকম বিভিন্নতা রয়েছে। একই শস্যের ক্ষেত্রে অঞ্চল ভেদে বিভিন্নতা রয়েছে। শস্যের শ্রেণীর বিভিন্নতা অনুসারে লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে ফার্ম-ভিত্তিক তথ্য এটা বলে দিচ্ছে যে, জমি যদি ভূস্বামী এবং ধনী কৃষকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে তারা গরীব ও মাঝারি কৃষকের তুলনায় উৎপাদন খরচ নিম্নস্তরে রাখতে সক্ষম। তুলনামূলকভাবে গরীব চাষীরা ধনীদের চেয়ে উঁচু দামে চাষের উপরকণ ক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং জমিও যন্ত্রপাতির জন্য ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। ভূস্বামী বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষক ও ধনী কৃষকেরা উঁচু মানের উপকরণ পায়, ভাল বাজারে তাদের প্রবেশের সুযোগ ঘটে, গরীব ও মাঝারি কৃষকের চেয়ে প্রতি ইউনিট উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে অধিক আয় উপার্জন করে।

কৃষকের সর্বহারাশ্রেণীতে রূপান্তর

৭৬) এই পৃথকিকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষকের সর্বহারাশ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা, বিশেষ করে, গরীব এবং মাঝারি কৃষকের ক্ষেত্রে।

৭৭) সর্বাধিক ব্যাপকভাবে সর্বহারাতে রূপান্তরের মনুনা হল, বস্তুত, কৃষক কর্তৃক জমি হারানো। বিকৃষকিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে বর্তমানে জমি অধিগ্রহণের নীতির জন্য। অধিগ্রহণ হচ্ছে সরকার, গ্রামীণ ধনী চক্র এবং কর্পোরেট সেক্টরের দ্বারা।

৭৮) সর্বহারাশ্রেণীতে রূপান্তরণের আর একটি দিক হল এই যে, বিরাট অংশের কৃষককে ভাড়া শ্রমিকের বাজারে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, তবে তাদের মর্যাদা বহুলাংশে রক্ষিত থাকছে।

৭৯) ফার্ম স্তরে সমীক্ষায় দেখা গেছে, এমন কি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি স্তরের কৃষকদের ফার্মে প্রযুক্ত পারিবারিক শ্রমের অংশ ঐ ফার্মে নিযুক্ত ভাড়া করা শ্রমের চেয়ে কম। যে কোন ক্ষেত্রে, প্রতিটি গ্রামে গরীব ও মাঝারি কৃষকের পরিবার (এবং প্রায়ই বেশিরভাগ শ্রমিক) কাজ করে ভাড়া শ্রমিক হিসেবে অন্যের ফার্মে এবং ফার্মবিহীন কাজে। সুতরাং কে শ্রম দিচ্ছে বা দিচ্ছে না এর উপর ভিত্তি করে মাঝারি কৃষককে গরীব কৃষক থেকে পৃথক করা আর সম্ভব নয়।

৮০) সাধারণভাবে কৃষিকাজের খরচ এত বেড়ে গেছে যে, বাইরে প্রায়ই কঠোর পরিশ্রম না করে তাদের পক্ষে জীবিকা অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি, কৃষিতে যান্ত্রিকিকরণ ঋতুভিত্তিক পারিবারিক শ্রম বিনিয়োগের উপর বড় রকম প্রভাব ফেলেছে। খুব অনুন্নত এলাকা ছাড়া অন্যত্র ট্রাক্টার -ভিত্তিক চাষ জমি প্রস্তুতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে, এবং মাটির নীচের জল দ্বারা সেচের ক্ষেত্রে মোটর পাম্প চালিত প্রযুক্তি প্রাধান্য পায়। দেশের প্রায় সর্বত্র ফসল মারানিতে যন্ত্রের ব্যবহার প্রাধান্য পাচ্ছে,ফসল কাটার যন্ত্র গম তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ধানের রোয়া লাগানোর কাজও কোনকোন এলাকায় যন্ত্রের দ্বারা হচ্ছে (দৃষ্টান্ত তামিলনাড়ু)। এ সকল পদ্ধতির সামগ্রিক ফল হল, শস্য উৎপাদনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে পারিবারিক শ্রম বিনিয়োগ দেশের অনেক স্থানে (যদিও সর্বত্র নয়) ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অধিকন্তু, যান্ত্রিকিকরণের ফলে কৃষি কাজে আগের তুলনায় কম ঝামেলা দেখা দেয়, তাতে কোন কাজে শ্রমের চাহিদা দ্রুত বেড়ে গেছে। যে কাজ শুধু পারিবারিক শ্রম দিয়ে করা হতো (উদাহরণ স্বরূপ, আগে যেখানে ফসল কাটার জন্য সাতদিন বা আরও বেশি সময় লাগতো এখন সে কাজ করতে হয় মাত্র দু'দিনে।) তাতে এখন ভাড়া শ্রমের প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা ঠিক যে, যন্ত্র মানুষের কাজের জায়গা দখল করে নিচ্ছে, এবং শ্রমিক এখন নিযুক্ত হচ্ছে যন্ত্র চালানোর কাজে, আগের মত কৃষিতে প্রচলিত কায়িক শ্রমের জন্য নয়। এই অগ্রগতিতে এটা বোঝা যায় যে, উপকরণ ব্যবহার এবং উৎপাদন সংগ্রহের কারবারে আগের তুলনায় অনেক বেশি করে পুঁজি ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে কৃষকও অংশ গ্রহণ করে।

৮১) যদি গরীব কৃষক পরিবারের এক বছরের শ্রম ক্ষমতা তিনভাগে বিভক্ত করা হয়— ফার্মে পারিবারিক শ্রম, ফার্মে মজুরি শ্রম এবং ফার্মবহির্ভূত মজুরির কাজ সেখানে প্রথমোক্ত

কাজের পরিমাণ কম, অনেক গ্রামে তা ৫০ শতাংশের কম।

৮২) ভাড়া শ্রমের বাজার প্রসারিত হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক বেশি অংশের মানুষ এতে অংশ নিচ্ছে। অনেক গ্রামে এবং গ্রামীণ এলাকায় যে সকল পারিবারিক সদস্য কৃষি কাজে মজুরি শ্রম হিসেবে যোগ দিচ্ছেন, যারা প্রাথমিকভাবে কৃষক পরিবারের সদস্য, তাদের সামগ্রিক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

৮৩) প্রসঙ্গত এটা উল্লেখযোগ্য যে, কায়িক শ্রমিকসহ গরীব ও মাঝারি কৃষক একসাথে মিলে গ্রামের মোট পরিবারের ৬০ শতাংশ বা তারও বেশী হবে। অধিকাংশ গ্রামে গরীব কৃষককে কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিক থেকে আলাদা করা কষ্টকর।

৮৪) শ্রমশক্তির মধ্যে কৃষকের ভূমিকার অংশ সম্পর্কে লেনিন যে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, সে বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক। "সাধারণ কৃষি প্রণালীতে এই সর্বহারা কৃষক জনতার তাৎপর্য" শীর্ষক একটি আলোচনায় লেনিন সামাজিক অর্থনীতির প্রাক্ ধনতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক প্রণালীর মধ্যে উল্লেখ করেন, প্রথম বিষয়টি এই যে, তারা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে বা আত্মীয়তাসূত্রে প্রতিনিধিত্ব করে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, কৃষকের যে অংশটি জমির এমন ক্ষুদ্র খণ্ডের মালিক, যেখান থেকে জীবিকা নির্বাহের আয় উপার্জন অসম্ভব, এবং যা কেবল 'সহায়ক পেশা' হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে, তারা ধনতান্ত্রিক প্রণালীতে সর্বোপরি এক বেকারদের রিজার্ভ বাহিনী গঠন করে। মার্কসের ভাষায় এটা হল সেনাবাহিনীর একটি গোপন আকৃতি। এটা মনে করা ভুল যে, এই রিজার্ভ বেকার বাহিনী গঠিত হয় শুধু কর্মহীন শ্রমিক দিয়ে। তাতে আরও অন্তর্ভুক্ত আছে ' কৃষক' বা ' ক্ষুদ্র কৃষক', যারা ক্ষুদ্র জমিখণ্ড থেকে অর্জিত আয়ের দ্বারা বাঁচতে অক্ষম, যাবা জীবিকার উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে প্রধানত নিজেদের শ্রমশক্তিকে ভাড়া খাটায়।

৮৫) গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের একটি মূল বিষয় হল, গরীব ও মাঝারি কৃষককে নিঃস্ব করে যে নীতি, সেই নয়া উদারনীতি মোকাবিলার লড়াইয়ে তাদের শক্তি যোগানো। একই সময়ে সমীক্ষক দলের সদস্যগণ, যেখানে সম্ভব সেখানে, প্রযুক্তিবিদ্যা যথার্থভাবে ব্যবহৃত করে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমবায়ী প্রচেষ্টার সম্ভাবনা খুলে দেবার প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ করেন। তারা কৃষকদের দর কষাকষির ক্ষমতা, যেমন, উপকরণ ক্রয় ও উৎপাদন বিক্রি, এ ধরনের কাজে ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়েও পর্যবেক্ষণ করেন।

কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রের গ্রামীণ শ্রেণীসমূহ

৮৬) প্রচলিত ধারায় গ্রামীণ জনগণের একটা বড় অংশ, যারা সরাসরি শস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত নন, তারা হলেন, প্রথমত প্রথাগতভাবে জাতভিত্তিক শিল্পীবৃন্দ, যেমন, কাষ্ঠশিল্পী, কর্মকার, কুম্ভকার, তাঁতী এবং প্রথাগত জাতভিত্তিক পেশায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ। বর্তমান সময়ে এই অংশের সংখ্যাটি কমে গেছে এবং প্রথাগত কাজের মধ্যে ব্যাপৃত থাকার বার্ষিক সময়ও হ্রাস পেয়েছে।

৮৭) দ্বিতীয়ত, কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং স্বনির্ভর ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে। যেমন দোকানদার, রাবার মালিক, বাইসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন মেরামত কেন্দ্রের মালিক, ইলেক্ট্রিশিয়ান এবং এরূপ অনেক ব্যক্তি।

৮৮) অনেক গুরুত্বপূর্ণ নতুন পেশার আবির্ভাব ঘটেছে গ্রামীণ এলাকায়। প্রথমত, গড়ে উঠেছে নতুন ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ উৎপাদকবৃন্দ : দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুধের ডেয়রী, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি মালিক, এবং অন্যান্য উৎপাদনের ইউনিট। এগুলোতে কাজ করছে পরিবারের শ্রমিকেরাসহ মালিকেরা, পরিবারসহ ভাড়া শ্রমিকেরা অথবা পুরোপুরিভাবে ভাড়া শ্রমিকেরা।

৮৯) দ্বিতীয়ত, বর্তমানে গ্রামে বসবাসকারি বাণিজ্যিক ব্যক্তি এবং ব্যবসাদারও আছে। গ্রামস্তরের ব্যবসায়িক ব্যক্তি যারা আছে, তার মধ্যে নতুন তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন হল উপকরণ বাণিজ্যিক ব্যক্তিদের অভ্যুদয়। বর্তমান সময়ের উন্নয়নের স্তরে রাসায়নিক উপকরণ, যার মধ্যে উদ্ভিদ সংরক্ষণের কেমিক্যালও আছে, তা সুপারিশের ভূমিকা গ্রহণ করে উপকরণের ডিলারগণ। বৃহৎ কৃষকদের খরচের খুব তাৎপর্যপূর্ণ নির্ধারকের ভূমিকা নেয় এই উপকরণ ডিলাররা। এ সবের জন্য সেবা পরিবেশকও আছে (ভূস্বামীসহ), যারা যন্ত্রপাতি লীজ দেয়।

৯০) তৃতীয়ত, গ্রামে বেতনভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ রয়েছে। সাধারণত এরা রাজ্য স্তরের বেতনভোগী ব্যক্তি, অর্থাৎ সরকারি এবং আধা সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক এবং অন্যান্য—কিন্তু এমন ব্যক্তিও রয়েছে যারা রাজ্যের কর্মচারীর বাইরের বেতনভোগীর চাকরি করে। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করা সমীক্ষক দলের তৈরি একটি পর্যবেক্ষণে এই ধারণা জন্মায় যে, গ্রামীণ মানুষের প্রতি গ্রামীণ মধ্যবিত্ত অংশের নৈকট্যবোধ আগেকার সময়ের গ্রামীণ আন্দোলনের অগ্রগতির মত একরূপ নয়। গ্রামীণ মতামত তৈরির উপর সমসাময়িক অকৃষি মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু গরীব মানুষের প্রত্যাশার অংশীদার হওয়া অথবা তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামে শামিল হওয়ার ঘটনা আর আগের মত হচ্ছে না, অন্তত দেশের কোন কোন অংশে।

৯১) চতুর্থত, একটা অংশের গ্রামীণ শ্রমিক আছে যারা গ্রাম স্তরে সরকারি প্রকল্পে কাজ

করে। এর মধ্যে প্রকল্পের শ্রমিকেরা, মিড-ডে-মিল কর্মসূচির শ্রমিকেরা এবং কিছু কর্মসূচি হল ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন (এন আর এইচ এম)— যেমন, এ এস এইচ এ (আশা)। পূর্বের অবস্থার সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, বর্তমানে গ্রামে এমন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যার সদস্যদের আমাদের গণসংগঠনের মধ্যে সংগঠিত করা যাবে (এবং করা হচ্ছে), এবং সেখানে এরা, যেমন কৃষক এবং গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকেরা, প্রগতিশীল ভূমিকা নিতে পারেন।

৯২) পঞ্চমত, গ্রামীণ এলাকায়, আধা এবং ছোট টাউন এলাকায় এমন একটি শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা গ্রামীণ ধনীর চক্র—এমন লোক যারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু সম্পদ এবং ক্ষমতা অর্জন করেছে এ সকল কাজের দ্বারা,যেমন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং এবং কৃষিভিত্তিক উৎপাদন, জমির ব্যবসা, এবং নির্মাণ কার্য, ব্যবসা, সেবামূলক কাজ এবং ভাড়া খাটানো ও অর্থপ্রাপক হিসেবে। এগুলো হল উদারনীতির উত্তর সময়ের সরকারি নীতিসমূহ, চুক্তিসমূহ এবং কনসেশনসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ সুবিধাসমূহ। নয়া উদারনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পিছটান সৃষ্টি করেছে প্রাইভেট ঋণদাতা মহাজন শ্রেণী, যা প্রধান শোষকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

৯৩) যে পাঁচটি শ্রেণীর কথা উপরের পাঁচটি প্যারাগ্রাফে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে কৃষি জমির মালিকদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে অথবা না-ও যেতে পারে। তাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এসকল ব্যক্তি বা পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস শস্য উৎপাদন থেকে নয়।

জাত, বর্ণ, লিঙ্গ এবং অন্যান্য সামাজিক বৈষম্যভিত্তিক সামাজিক নিপীড়ন

৯৪) জাত, বর্ণ, লিঙ্গ এবং অন্যান্য ধরনের সামাজিক বহিষ্করণ এবং বৈষম্যের ইশ্যুসমূহ, যা যাজকতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে, তা ভারতের কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ রূপ।

৯৫) সামাজিক গ্রুপ দ্বারা বহিষ্করণ বা পৃথকিকরণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। এরূপ ভেদাভেদ নানা রকম হিংসা, খুন এবং শারীরিক নিগ্রহের রূপ নিতে পারে। এই বহির্ভুক্তি এবং জাতিভেদ সামাজিক বৈষম্য পীড়িতদের স্বাধীনতার উপর এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানে। তামিলনাড়ুর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রামের সংগঠন কতগুলি দুর্বৃত্তামি এবং বর্বরোচিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে, যেখানে বৈষম্যমূলক আচরণ এখনও বিরাজ করছে।

৯৬) প্রত্যক্ষ বৈষম্য এমন পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত জাত-পাতের বাইরে অবস্থানকারী

অত্যাচারিত সম্প্রদায়গুলির প্রতি বঞ্চনা এবং অবহেলা, তাদেরকে প্রণালীবদ্ধভাবে নিম্নস্তরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, কাজকর্ম এবং সামাজিক মর্যাদা হানিকর অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে।

৯৭) প্রতিটি বৈষম্যমূলক আচরণ বা বঞ্চনার পুঞ্জীভবন আর্ত ও পীড়িতদের স্বাধীনতা ও জীবিকার উপর অসংখ্য বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে। স্বত্বের অধিকারের প্রকৃতি, যেমন, তাদের জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির, শুধু মালিকানা নির্ধারণ করে না, প্রতিফলন ঘটায় তাদের রোজগার, জীবিকা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও বেঁচে থাকার উপর। গ্রামীণ স্তরের ভূমি বেচা- কেনা, বন্ধক দেয়া এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের পদ্ধতিসমূহ বর্তমানে কোথাও বাজার থেকে মুক্ত বহির্ভুক্তি এবং বৈষম্য সৃষ্টি কারক বিষয় নয়। জাত-পাত শ্রমের বিভাজন এবং সম্পদের বণ্টন ঘটায় এবং তা ঘটে বাজার নীতির বাইরে। আবাসন এবং শৌচ ব্যবস্থা কেমন হবে এবং ফলত নিরাপদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ এবং জীবনযাত্রা হবে কিনা তা নির্ধারিত হয় এই জাত ব্যবস্থা দ্বারা।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক— পুঞ্জিভূত বঞ্চনা এবং শিক্ষা ও সচলতা সম্পর্কিত বিদ্যমান পক্ষপাতিত্ব স্বাধীনতাকে মূলগতভাবে বিঘ্নিত করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে যান্ত্রিক প্রভাব ফেলে মজুরির উপর, পেশাগত পরিবর্তনশীলতার উপর এবং পেশাগত অবস্থানের উপর।

৯৮) অর্থনৈতিক শোষণ এবং বঞ্চনা ছাড়াও মহিলারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণ, সমান এবং স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন; তারা গ্রামীণ এলাকায় নিকৃষ্ট ধরনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি- বিরোধী বাধা, লিঙ্গ-ভেদ-জনিত বিদ্বেষ এবং হিংসার শিকার হন।

৯৯) আদিবাসী জনগণের মধ্যে কৃষির সম্পর্ক, ভারতে কৃষি সম্পর্কিত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

১০০) তপশিল উপজাতি সম্পর্কে, বর্ণনা এবং বিশ্লেষণের জন্য, আদিবাসী পরিবারবর্গ এবং উপজাতি গ্রামসমূহ, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব। আদিবাসী পরিবার বাস করে একটা অংশ বা গ্রুপ হিসেবে বহুবিধ জাত সম্বলিত গ্রামের মধ্যে । সেখানে নিয়মিত ঋতুভিত্তিক নীচু জমিতে কৃষি কাজ করে থাকে 'উপজাতি গ্রাম' বলতে সে সব গ্রামকে বোঝায় যা 'উপজাতি অঞ্চলে' অবস্থিত। সে অঞ্চলে আদিবাসী পরিবারসমূহ বিপুল সংখ্যাধিক্য (বা পুরোপুরি) বাস করে (উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাড়া অন্য রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে, উঃ পূর্বাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট)।

১০১) প্রথম প্রকারের গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ তপশিলী উপজাতি জনগণ— তাদের আয়ের, শিক্ষার, আবাসনের, নিয়মিত শ্রেণীর, কর্মসংস্থানের এবং উন্নয়নের অন্যান্য সূচক-

সমূহের সমষ্টির মাপকাঠিতে— সঙ্গতিপূর্ণভাবেই গ্রামের মধ্যে দুঃস্থতম গ্রুপ হিসেবে পরিগণিত হয়। পরবর্তী রকমের গ্রামের ক্ষেত্রে তারা (এবং যে স্থানে তারা অবস্থিত তা) বিশেষ ধরনের অনগ্রসরতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। সংঘটিত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং সামাজিক পরিকাঠামো, জনগণের জীবিকা এবং আয়, যা গুণগতভাবে অনাদিবাসী গ্রামগুলির চেয়ে নিম্নস্তরে বিরাজ করে। এ সকল বৈশিষ্ট্য দিয়ে তারা এখনও চিহ্নিত হয়। চাষের পদ্ধতিতেও এই গ্রামগুলি পৃথক। এ সকল গ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সম্পত্তিসমূহ প্রায়ই বাণিজ্য বহির্ভূত পণ্য, কৃষি জমি (যেখানে স্বত্ব প্রায়ই অনিয়মিত), কুটীর এবং পশুপালনের আচ্ছাদন।

১০২) ভারতে বর্তমানে কৃষির অভ্যাস প্রথাগত কারিগরি শিল্প বলেই টিকে থাকছে। এবং তা আছে সর্বোপরি দেশের আদিবাসী গ্রামগুলিতে। কৃষি সাধারণত সীমিত আছে খারিফ শস্য চাষে; এবং নিম্নস্তরের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে নিম্নমানের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অনুপস্থিতির ফল হল এই যে, উপজাতি গ্রামগুলো কৃষি পণ্যের এবং বীজের বিভিন্নতার একরকম আধারে পরিণত হয়েছে। মিশ্র শস্যের প্রথাগত প্রণালী দ্বারা ব্যাপক পরিসরে বীজ এবং শস্য সংরক্ষিত হয়েছে । ভারতের বিভিন্ন অংশে তা চলছে এবং রেকর্ডভুক্ত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ মধ্যপ্রদেশের অনুপ্পুর জেলাতে দানাশস্য, ডাল, সবজি, এবং তৈলবীজের মত ৪২ টি শস্যের ব্যাপক পরিসরের ময়দন গড়ে উঠে ছে ২০০৮ সালে, প্রধানত মিশ্রিত শস্য হিসাবে অথবা তরিতরকারির শস্যে।

১০৩) একত্রে জড়ো করা জীবনধারণের উৎসসমূহের অবিরাম বয়ে চলা ভূমিকা হল আদিবাসী পরিবার অর্থনীতির পরিষ্কার চিত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২০০৭ সালের সমীক্ষা অনুসারে পূর্বের একসময় রাজস্থানের উদয়পুর জেলার ডুঙ্গারিয়া গ্রামে ফর জনগণ বন থেকে সংগ্রহ করত মহুয়া ফুল, টেন্ডু পাতা, মধু, অন্যান্য ফল, ফুল এবং ওষুধ গাছ, এবং শিকার করত পারট্রেডজ (এক রকম পাখি), গ্রাউস (এক রকম পাখি), খরগোস, হরিণ, এবং বুনো বরাহ। তারা আরও সংগ্রহ করত লাকড়ি, ঘর ও লাঙল তৈরির কাঠ, এবং প্রাথমিক স্তরের গৃহস্থালির আসবাবপত্র বানানোর কাঠ, প্রধানত খাট তৈরির কাঠ। বর্তমানে সংগ্রহ করা হয় লাকড়ি ও সাধারণ ছোটখাটো নির্মাণ কার্য ও যন্ত্রপাতি বানানোর কাঠ, মহুয়া ফুল। অন্যান্য বনজ সম্পদ, যা কম পরিমাণে সংগৃহীত হয়, কিন্তু যা জীবনধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তা হল রেসিন, বাঁশ, ফল (খেজুরসহ), ঘাস, মধু এবং রেড়ি।

১০৪) দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সাম্প্রতিক গবেষণা আদিবাসী জনগোষ্ঠীতে অধিকতর পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত তপশিলী উপজাতিদের সর্বহারায়

রূপান্তর ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ভূমিহীনতা বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যায় ভাড়া শ্রমিকের কাজে নিযুক্তির ঘটনাতে এর প্রতিফলন ঘটে। বস্তুত, এটা বলা যায় যে, ভারতের আদিবাসী জনতা — যারা হল কৃষক বন থেকে জীবিকা এবং অন্যান্য সাধারণ সম্পদের উৎস সন্ধানীরা, গ্রামীণ কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিকেরা এবং অদক্ষ স্থানান্তরগামী শহুরে শ্রমিকেরা ভারতের শ্রমদানকারী মজুত বাহিনীর সবচেয়ে দরিদ্র হীনবল সাধারণ স্তরের মানুষ। দ্বিতীয়ত, ধনতন্ত্র গ্রামীণ উপজাতি জনগণের অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে। একটি স্পষ্ট পৃথকিকরণের চিত্র এখানেই ফুটে উঠছে যে, উপজাতি এলাকায় জমির হোল্ডিং-র পুঞ্জিভবন এবং কেন্দ্রিভবনের সুবিধাভোগীরা, যারা পৃথকীকরণের সুযোগ গ্রহণ করছেন, তারা উপজাতি জনগণ থেকে উদ্ভূত হচ্ছেন না, তারা উপজাতি সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বাইরে থেকে আবির্ভূত হচ্ছেন।

১০৫) যদিও তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি জনগণের সংখ্যাবহল অংশ অনিয়মিত ক্ষেত্রে কায়িক শ্রম দেয়, একটি ক্ষুদ্র অংশ শহরে এবং গ্রামের নিয়মিত ক্ষেত্রে কায়িক শ্রম বহির্ভূত কাজে নিযুক্ত আছে। উদাহরণস্বরূপ, চাকুরির কাজে, দোকানের সহায়ক হিসেবে এবং সেবামূলক ক্ষেত্রে কর্মচারী হিসেবে অন্যান্য পেশায় যেখানে কর্মসংস্থানের শর্তাবলী অনিয়মিত ক্ষেত্রের কাজের শর্তাবলীর চেয়ে কম অবমাননাকর, এমন কাজে নিযুক্ত আছে। যদিও এসকল ক্ষেত্রের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, তার সামাজিক গুরুত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এসব কাজে যারা নিযুক্ত হন, সেই তরুণেরা আশাবাদী হয়, এবং তাদেরকে দেখা যায় গতিবর্ধক হিসেবে এবং মতামত নির্ধারক হিসেবে, বিশেষ করে তরুণদের জন্য।

১০৬) আমাদের সংগঠন হবে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চ্যাম্পিয়ান এবং যেখানেই সামাজিক বৈষম্যের ঘটনা ঘটবে সেখানেই মানুষ আমাদের সংগঠনকে যেন শনাক্ত করে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে। একই সাথে অন্যান্য ধরনের সামাজিক বঞ্চনাকে মোকাবেলা করার সংগ্রামে আমাদের থাকতে হবে সকলের অগ্রভাগে — উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষানৈতিক, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত এবং আবাসনের সুযোগ সম্বলিত বিষয়ে তুলনামূলকভাবে পেছনে অবস্থানকারী এবং আর্ত-পীড়িত সামাজিক গোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে শ্রমিক হিসেবে এবং শ্রম বিভাজনের দরুণ স্থানান্তরে নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সব বঞ্চনাকে মোকাবোলায় আমাদের সংগঠন থাকবে সামনের সারিতে।

১০৭) গোষ্ঠীগতভাবে বৈষম্য বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের ভূমিকা হবে ইতিবাচক এবং আপোষহীন। একই সময়ে শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথাটি আমরা যেন ভুলে না যাই। এই কাজ অপরিসীম জটিল হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, মধ্যবর্তী

জাতিগোষ্ঠীর সদস্যগণ যারা শ্রমজীবী মানুষেরই অংশ , তারাও প্রায়ই সামাজিক নিপীড়ক হয়ে যায়। যে দেশ সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যযুগীয় কাঠামো দ্বারা ছিন্নভিন্ন সেখানে পরিচিতি সত্তা জনগণের ঐক্যকে ভেঙে দেবার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তার পরিবর্তনে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই পরিষ্কার বিকল্প উপস্থাপন করতে পারে, একই সাথে সামাজিক পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারে।

গ্রামভারত থেকে কাজের জন্য স্থানান্তর গমন

১০৮) ভারতে গ্রামীণ এলাকা থেকে শ্রম অন্যত্র সরে পড়ার বিষয়টির এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং তা ঐতিহাসিকভাবেই দেশে পুঁজিতন্ত্র বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাধারণভাবে শ্রমের স্থানান্তর গমনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে উদারিকরণের নীতি শুরু হওয়ার সময় থেকে। এটা হল সমাজকর্মী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ। সম্প্রতি যেভাবে স্থানান্তরগমন বৃদ্ধি পেয়েছে তার অনেকটা অস্থায়ী স্থানান্তর গমন, অর্থাৎ তা গন্তব্যস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য হয়নি। ২০০৮ সালে এন এস এস ও মাইগ্রেশনের উপর যে সমীক্ষা সংঘটিত করেছে, তাতে তারা মাইগ্রেশন সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিষয় অনুধাবন করতে পারেনি। সরকারি তথ্যের একটি বিশেষ ঘাটতি এই যে, স্বল্পকালীন মাইগ্রেশন (অভিপ্রমাণ)-কে রপ্ত করার ক্ষেত্রে তা অপর্যাপ্ত হয়েছে। তাতে খুব স্বল্পকালীন মাইগ্রেশন এবং বার বার স্বল্পকালীন মাইগ্রেশনের চক্কর ঐ তথ্যে পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল।

১০৯) যদিও গ্রাম থেকে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে শহরে উভয় স্থানান্তরই বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি গ্রাম থেকে শহরে অভিপ্রয়াণ গ্রাম থেকে গ্রামে অভিপ্রয়াণকে সকল ধরণের স্থানান্তর স্রোতের মধ্যে সবচাইতে বেশি করে প্রতিস্থাপন করেছে। অবশ্য তাতে গ্রাম থেকে গ্রামে স্থানান্তরের চলমান প্রক্রিয়ার তাৎপর্যকে খাটো করে দেখা হচ্ছে না।

১১০) সাধারণত সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ (অর্থাৎ পরিযায়ীদের সংখ্যা অনুসারে)পরিযায়ী শ্রমিকদের উৎস বাজ্য এবং অঞ্চল হল—

উত্তরপ্রদেশ, বিহার , ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ। অধিকন্তু, অন্যান্য সকল রাজ্যেই স্থানান্তরের কিছু পকেট রয়েছে। ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত মূল প্রধান এলাকা থেকে স্থানান্তর গমনকারীদের গন্তব্যস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৯০-র দশক জুড়ে ঐ সকল গ্রাম থেকে স্থানান্তরগমন চলে পাঞ্জাব ও হরিয়াণার দিকে এবং উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের দিকে, যে পাঞ্জাব হরিয়াণা ইতোমধ্যে উন্নতি লাভ করেছে বিশেষ করে ধান উৎপাদনে উন্নতি লাভ করে ফেলেছে তার দিকে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই স্থানান্তরগামীরা গন্তব্যস্থল হিসেবে মোড় ঘুরিয়েছে দক্ষিণ বরাবর, যেমন কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক,

এবং অতিসম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ বরাবরে।

১১১) যাযাবর শ্রমিকদের কাজের স্তর হল সাময়িক পর্যায়ভুক্ত এবং স্বনির্ভরগোছের। প্রধান পেশা হল নির্মাণ সংক্রান্ত, খনি খননমূলক ও যন্ত্রযোগে উৎপাদন এবং সেবামূলক। যদি পরিযায়ীদের সরকারি তথ্য অপ্রতুল হয়, তবে সেখানে মহিলা পরিযায়ী থাকে আরও বেশি। মহিলা স্থানান্তরিত হওয়ার প্রধান কারণ স্থানান্তরে বিবাহ, এবং পুরুষদের কাজের তথ্য সংগ্রহের চেয়ে মহিলারা বিভিন্ন ধরনের যে কাজ করে তা নির্ধারণ কষ্টকর। যা হোক, দেখা যাচ্ছে যে, যদিও পুরুষ পরিযায়ী শ্রমিকের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা যারা কাজের জন্য স্থানান্তরে আসে, প্রকৃত অর্থে তাদের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে কম। এই গমনের হার পুরুষের চেয়ে বেশি (কারণ তা হয় নীচু তলায়) মহিলাদের ক্ষেত্রেও কাজের ধরণ নির্মাণ সংক্রান্ত, সেবামূলক এবং বেশির ভাগই অপ্রচলিত সাময়িক ও স্বনির্ভরযুক্ত।

১১২) এককভাবে মহিলাদের স্থানান্তর গমনে সামাজিক বাধা রয়েছে, বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে। তথ্যসমূহের মধ্যে কৌতুহলের বিষয় এই যে বৈবাহিক স্থানান্তরগমনের পরিসর বেড়েছে। অংশত এ ঘটনা উত্তর পশ্চিম রাজ্য ও অঞ্চলগুলিতে নিম্নমানের যৌন অনুপাতের প্রতিফলন ঘটায় সেখানে পূবের রাজ্যগুলির তুলনায় বৈবাহিক সুত্রে অভিপ্রয়াণ বেড়েছে।

১১৩) সামনের বছরগুলিতে এই মাইগ্রেশন বাড়তে থাকবে, বিশেষত পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি বাড়ার সাথে তাল মিলিয়ে। অতএব আমাদের পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকে এই স্থানান্তর চলনের মাত্রা ও অভিমুখ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে, দেশের বিভিন্ন অংশের পরিযায়ী পরিবারগুলি কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদের বাসস্থানের এলাকার পরিবারের লোকজন কি অবস্থায় রয়েছে সঠিকভাবে তাদের শ্রম ও জীবিকা সম্পর্কিত দাবি-সনদ তৈরি করতে এসব বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শ্রমিক-কৃষক জোট

১১৪) কৃষকদের বিভিন্নতা, সর্বহারাতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া এবং স্থানান্তর গমনের বর্তমান স্তরের প্রবণতা গ্রামীণ শ্রমিক এবং গরিব ও মাঝারি কৃষকের ঐক্য গড়ে তোলার নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে তাকে হাতিয়ার করে শ্রমিক-কৃষক জোট গড়ে তোলার সম্ভাবনা উপস্থিত করেছে এই প্রবণতা সমূহ। সামগ্রিকভাবে কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমিকদের শ্রেণীগত দাবি আদায়ের সংগ্রামের জন্য কৃষক-শ্রমিক জোটে শ্রমিকদের সমর্থন প্রয়োজন অনুভূত হয়। আগামী বছরগুলিতে নতুনভাবে এবং চিন্তা ভাবনা করে এই জোট গঠনের

জন্য আমাদের প্রয়াস চালাতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রামীণ ও নগর এলাকায় অকৃষি কর্মসংস্থানকে নিশ্চয়তা দিতে,গ্রাম ও শহরে গণবন্টণ ব্যবস্থা সার্বজনীন করতে, গরিবদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে এবং জল, শৌচ ব্যবস্থা, ঘরে ঘরে বিদ্যুতের প্রাথমিক সুবিধাসমূহ পৌঁছে দিতে; বিদ্যালয় শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিষেবা সার্বজনীন রূপ দিতে এবং জাতিগত, লিঙ্গগত এবং অন্যান্য সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য সংগ্রাম গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই জোট গঠন সম্ভব।

১১৫) ১৯৯১ সাল থেকে, যখন বিশ্বায়ন এবং উদারিকরণের ত্বরান্বিত নীতিসমূহ এদেশে লাগু হল, তখন থেকে এক নাগারে বিভিন্ন আইন, বিধি, নিয়ম কানুন, নির্দেশাবলী এবং অন্যান্য নীতিভিত্তিক পদক্ষেপ কার্যকর হল। এর ফলে গ্রামীণ ভারতে গ্রামীণ ধনীদের স্বার্থে এবং বৃহৎ বুর্জোয়া ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী মিত্রদের স্বার্থে শ্রেণী শক্তিসমূহের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটল সোজাসুজি। এগুলোতে এমনসব নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার দ্বারা গ্রামীণ ভারতের কৃষিসংক্রান্ত ও ফার্মবহির্ভূত ক্ষেত্রে উৎপাদন, মজুতভান্ডার এবং বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে, বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের সুযোগ ঘটে যাবে। এছাড়া সামাজিক পরিকাঠামোসমূহের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারের পদ্ধতিগুলিকেও প্রভাবান্বিত করবে।

১১৬) ঋণের ক্ষেত্রগুলিতে, কৃষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এবং ভূমি ব্যবহার ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে নয়া উদারিকরণ নীতিসমূহ ও তাদের কার্যকারিতা এবং সরকারের নতুন নতুন স্কিম ও কর্মসূচি তাৎপর্যপূর্ণ। নয়া উদারিকরণ কালের এ সকল কার্যাবলীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে পেশ করছি।

১১৭) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং মানুষের সুষ্ঠু জীবন-যাপনের বিভিন্ন দিকে এসব কার্যাবলির প্রতিফল রয়েছে। নীতি ও প্রকল্পসমূহ এবং তাদের কার্যকারিতার ফলাফল প্রতিরোধকল্পে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং জনজমায়েতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। রোজগার, দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক সুবিধা সংক্রান্ত মাপকাঠি থাকে মানোন্নয়নের সূচক বলে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে আমরা উদ্ভাবন করি।

১১৮) বিগত দু'দশক ও তার বেশি সময়ের মধ্যে নতুন অন্য একটি বিষয় যা উঠে এসেছে তা হল জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যার প্রতিফলন ঘটে কৃষিতে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

গ্রামীণ ঋণ

১১৯) ১৯৯০ এর দশক ছিল সামাজিক ও উন্নয়নমুখী ব্যাঙ্কিং-এর বিপরীত প্রক্রিয়ার একটি দশক। এ সময়ে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণপ্রদানে বৃদ্ধির হারের সোজাসুজি পতন ঘটে, কৃষি ঋণের অভিমুখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের দিক থেকে অন্য দিকে মোড় ফিরে যায় এবং সুদখোর মহাজনদের থাবা গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়। ২০০৪ সালে কৃষিঋণের সীমিত পুনরুত্থান ঘটেছিল। কিন্তু তাতে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বিগত দশ বছর কৃষিঋণ বৃদ্ধির এক চতুর্থাংশ চলে যায় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, রপ্তানি খাতে, ঘনপুঁজির কৃষিতে এবং ব্যবসায়িক কর্পোরেশনগুলিতে পরোক্ষ লগ্নির কারবারে। ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ প্রদান করেছে তাতে বৃহৎ ব্যক্তিগত ঋণ-গ্রহীতার সংখ্যা বেড়ে যায়।

১৯৯০ ও ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময় ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৯২ শতাংশ থেকে ৪৮ শতাংশ নেমে পড়ে, অপরদিকে একই সময়ে ১০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি টাকার ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৪শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশ উঠে আসে। এই বৃহৎ ঋণগুলো প্রাথমিকভাবে প্রদান করা হয় কৃষিতে নতুন ধরণের কাজের জন্য। যেমন বিরাট অঙ্কের কৃষিবিষয়ক বিশাল বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির জন্য। ২০১১ সালে মোট কৃষিঋণের ৩৩ শতাংশ এবং প্রত্যক্ষ কৃষিঋণের ২৬ শতাংশ শহর এলাকার বা মেট্রোপলিটন কেন্দ্রের ব্যাঙ্কের শাখাগুলি থেকে দেয়া হয়েছে।

১২০) ১৯৯১ সালের পর দীর্ঘমেয়াদি কৃষিঋণের অংশের তীব্র পতন ঘটে। এবং আনুসঙ্গিকভাবে মোট কৃষিঋণের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ বেড়ে যায়। ফলে কৃষিতে স্থির মূলধন গঠনের জন্য ব্যবহৃত কৃষি ঋণের অংশ ক্ষুদ্রতর হয়ে যায়।

১২১) প্রাথমিক কৃষিঋণ সমবায় সমিতি (প্যাকস)-কে নিয়মিত কৃষিঋণ পদ্ধতির জানালা বলে বিবেচনা করা হয়,যার সঙ্গে কৃষক সমাজের শ্রমদানকারী শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের সবচেয়ে বেশি অধিকার রয়েছে। সমবায় ঋণের মধ্যে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কৃষক সমাজকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যেটুকু ক্ষমতা ছিল, তাকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তাদের উদ্যোগ কেন্দ্রিভূত করে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে। প্রকাশ বক্সি কমিটি ভারতের প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে খাটো করে এগুলোকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের "ব্যাঙ্কিং করেসপণ্ডেন্টস" রূপে রূপান্তরিত করার জন্য সুপারিশ করেছে, টাকা জমা রাখার উপর বাধা আরোপ করেছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও তাদের খরিদ্দারদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত করেছে।

ইউ পি এ ২নং সরকার সে সকল সুপারিশ গ্রহণ করেছে, তার ফলে ভারতের ৯০,০০০ প্যাক্স ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্য কৃষক, ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং সমবায়ের যৌথ আন্দোলনের প্রতি

সাড়া দিয়ে সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে সমিতিগুলির ভয় এখনও রয়ে গেছে।

১২২) তৎসত্বেও, যদিও ফর্মাল ঋণদান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তার অভ্যন্তরে অসাম্য বিদ্যমান, তথাপি এই পদ্ধতিকে পুনর্বহালের চেষ্টা ২০০৩- ০৪ সালের পর কৃষি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বাণিজ্য উদারিকরণ ইস্যু

১২৩) পূর্ববর্তী ইউ এস এস আর এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্যে এক মেরু বিশ্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এ সময়ে ১৯৯৪ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আবির্ভূত হয়। এই সুযোগে কৃষি, সেবা, মেধাস্বত্বা, বিরোধ মীমাংসা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর বিভিন্ন চুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাতে এই দেশগুলির সার্বভৌমত্ব দারুনভাবে বিঘ্নিত হয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের খুশিমত কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত দু'দশকে ডব্লিউ টি ও-র অন্তর্গত শক্তিসমূহের মধ্যে ভারসাম্যের কিছু রকমফের ঘটেছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য বহাল রয়েছে। ভারতের নয়া উদারবাদি শাসকশ্রেণী তাদের উপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আরোপিত চাপের কাছে ন্যক্কারজনকভাবে নতি স্বীকার করেছে, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তা ঘটেছে চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে সমঝোতার কারণে।

ভারতের কৃষিসম্বলিত অর্থনীতি এবং কৃষকদের উপার্জন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার শৃঙ্খলার দরুণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জি ডি পি-তে গুড্স এণ্ড সার্ভিসেস্- এর আমদানি ও রপ্তানির শেয়ার ১৯৯১ সালের ১৪ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশের কাছাকাছি এসেছে। ফলে WTO-র প্রভাব তীব্র হয়েছে।

১২৪) ১৯৯০- এর দশক থেকে প্রায় সকল শস্যের উপর রপ্তানি সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ভারত সরকার ধীরে ধীরে তুলে নিয়েছে। গম ও গম-জাত উৎপাদন, চাউল, ডাল এবং তৈলবীজ ইত্যাদি আমদানির উপর থেকে পরিমাণগত বাধা ২০০০ সালের পর থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন শস্যের উপর আমদানি শুল্ক দারুণভাবে কমানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাতে শুল্কের যে নিম্নতম শুল্ক হার ভারত মেনে নিয়েছিল, তারও নীচে নামিয়ে দিয়েছে অধিকাংশ শস্যের শুল্ক হার। ১৯৯০- ৯১ এবং ২০১১-১২ সালের মধ্যে ভারতের কৃষিপণ্যের রপ্তানির হার ছিল ১৩ শতাংশ। ঐ সময়ে আমদানি হার ছিল ২১ শতাংশ। বাণিজ্যিক উদারনীতির পর বর্ধিত দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক দরদামের সহমতের অবস্থান

কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক দামের উবে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য ভারতে আমদানি করেছে— উঁচু পর্যায়ের একচেটিয়া বাজারের পরিবেশ তৈরি করেছে, তা ভারতীয় কৃষিতে নিয়ে এসেছে।

১২৫) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের সুবিধা অনুসারে যখন বিশ্ব বাণিত্য সংস্থাকে কব্জা করে নিয়েছে, তখন তারা তথাকথিত সিঙ্গাপুর ইস্যু নাম করে প্রথম ২০০১ সালে দোহায় এই শর্তগুলি চাপিয়ে দেয়; বাণিজ্যের সুবিধা, সরকারি সংগ্রহ, প্রতিযোগিতার নীতি, এবং বিনিয়োগ সুরক্ষা। বালি মিটিং-এ তারা বাণিজ্যিক সুবিধা অনুসারে অ্যাজেণ্ডা গ্রহণে বাধ্য করে। ভারত কিছু গড়িমসির পর শেষ পর্যন্ত ধনী দেশগুলোকে খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যু অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব বিষয়ক কিছু ইস্যুকে বাণিজ্যিক সুবিধার সাথে যুক্ত করতে সম্মতি দেয়। ভারত কেবল অস্থায়ীভাবে সরকারি মজুতের কর্মসূচীটি রক্ষা করে। ভারত বিষয়টি থেকে প্রস্থান না করে সাময়িক স্থগিত রাখতে সম্মত হয়। তাতে বাণিজ্যিক সুবিধার সুযোগ ঘটল। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে শাসকশ্রেণীর দুদোল্যমানতার আবার নিদর্শন হল বালি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও দেখা যায় ভারত এমন সব কায়দা অবলম্বন করে, যার অর্থ হল, ভারতের জনগণের স্বার্থ এবং অন্যান্য কম উন্নত দেশের জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে ভারত সরকার তার সাথে আপোষ করে।

১২৬) অসম কৃষির চুক্তি, যা অনুন্নত দেশসমূহের জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে বিবেচ্য, আমাদের পার্টি তার বিরোধিতা করছে।

১২৭) শ্রীলঙ্কার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফ টি এ) এবং ভারত- এ এস ই এ এন চুক্তি রাবার, কফি, চা, মশলা এবং নারকেল ইত্যাদি বাণিজ্যিক শস্যের চাষের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া সংঘটিত করেছে। ভারত- ই ইউ মুক্ত বাণিজ্যচুক্তিসহ আরও ৫৬টি অন্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে, এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপগুলিও আছে এই পাইপলাইনে। তারমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ইউ এস এ, জাপান এবং ইজরায়েল। আমাদের কৃষিকে উঁচু স্তরের ভরতুকিপ্রাপ্ত কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় জুড়ে দেয়া হয়েছে। এই সকল দেশের মন্দা লক্ষ লক্ষ কৃষক, দুগ্ধ প্রকল্পের চাষী এবং মৎস্যচাষীকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলির সাথে আলোচনা না করে এবং পার্লামেন্টে না এনে, এই চুক্তিতে সামিল হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে এই ক্ষতিকর নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কর্পোরেট মূলধন, কৃষি এবং রাষ্ট্র

১২৮) ভারতীয় এবং বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিরা যাতে এদেশের জমি দখল করতে এবং খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করার চেষ্টা সফল করতে পারে এজন্য ভারতের নয়া উদারনীতির সরকার সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে চলেছে। এস ই জেডগুলির জন্য, খনি খনন, শিল্প স্থাপন এবং নগরায়নের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ ও কৃষি জমি ও ফরেস্টের জমি রূপান্তরিত করার কাজ অনর্গল চলছে। এস ই জেড আইন বৃহৎ পুঁজিপতিদের ট্যাক্স কনসেশন দেয়, শ্রমিকদের অধিকার অস্বীকার করে এবং বাণিজ্যিক কর্পোরেশনগুলি যাতে জমির ফাট্‌কা কারবার করতে পারে এজন্য জমি অধিগ্রহণের সুযোগ এনে দেয়। যথাযথ ক্ষতিপূরণ, পুনরায় বন্দোবস্ত এবং পুনর্বাসন ছাড়াই বিশাল অংশের মানুষকে তাদের জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে। " দি রাইট টু ফেয়ার কম্‌পেনসেশন এন্ড ট্র্যান্‌স্পারেন্সী ইন ল্যান্ড একুই-জিশন অ্যাক্ট্" এই আইনটি দ্রুত জমি অধিগ্রহণের সুযোগ করে দেয়, এবং ক্ষতিপূরণ ও কার্যকর পুনর্বাসন এবং বন্দোবস্তের নিশ্চয়তা দেয় না। বর্তমান সরকার কর্পোরেটদের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ আইনকে আরও সুবিধাজনক করতে এবং বর্তমান আইনে জমিহারাদের জন্য যেটুকু অধিকার আছে তাকে আরও দুর্বল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১২৯) জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে। যাতে এরূপ অধিগ্রহণ প্রাক্ অনুমতি এবং প্রাপ্ত মতামতের নীতির ভিত্তিতে হয়, যাতে জমি ব্যবহারের নীতির অধীনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং পুনরায় বন্দোবস্তের ভিত্তিতে অধিগ্রহণ ঘটে এজন্য যথাসাধ্য হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা আমরা গ্রহণ করব।

১৩০) জমির সিলিং আইনের তরলীকরণ এবং জমির কারবারে দেশি ও বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ জমি ব্যবহারে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বিচার না করে শস্যের প্রকারভেদ ঘটানোর ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ডেকে আনবে। যদি জমি ব্যবহারের নীতি যুক্তিপূর্ণ, পরিবেশগতভাবে পুষ্টিসাধক এবং জাতীয় খাদ্য সার্বভৌমত্বের রক্ষক হিসেবে স্থির করতে হয়, তবে তাকে মুনাফা বৃদ্ধির যুক্তি এবং কর্পোরেট স্বার্থের মধ্যে নিক্ষেপ করা যাবে না।

১৩১) ভারতে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক কর্পোরেট হস্তক্ষেপের মাধ্যম প্রত্যক্ষ কর্পোরেট ফার্মিং নয়, তা হয় কন্ট্রাক্ট ফার্মিং। যদিও কন্ট্রাক্ট (চুক্তিবদ্ধ) ফার্মিং- এর দখলের জমি এখনও আবাদি জমির ক্ষুদ্র অংশ, তথাপি কিছু এলাকায় এবং বিশেষ কিছু শস্যের ক্ষেত্রে তা লক্ষ্যণীয় কন্ট্রাক্ট ফার্মিং- এর আকার নিয়েছে— যেমন পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে আলু এবং মধ্য প্রদেশে সোয়াবিন চাষের ক্ষেত্রে। আমাদের লাইন হল এটা নিশ্চিত করা যাতে ফার্মিং-এর চুক্তি

করতে উদ্যত চাষীদেরকে রাজ্য সরকার উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করে এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে কৃষকদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে এবং তাদের উপকরণ ক্রয় করতে এলে সেখানেও দর কষাকষির সময় সাহায্য করতে আমাদের সংগঠনকে গ্রামীণ এলাকায় উদ্যোগ নিতে হবে।

১৩২) আর একটি ক্ষেত্র, যেখানে কর্পোরেট হস্তক্ষেপ করতে চায়, তা হল মজুতভান্ডার এবং মার্কেটিং তাদের হাতে নিয়ে যেতে চায়। ভারতের খাদ্য নিগমকে তুলে দেয়া এবং তার সুবিধাসমূহ ছিনিয়ে নেবার প্রচেষ্টা চলছে। কৃষির রেগুলেটেড মার্কেটকে সরকারের প্রশাসনের আওতার বাইরে অবস্থানকারী মার্কেট দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা চলছে।

১৩৩) যখন বাণিজ্যিক কর্পোরেশন গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন যে শ্রেণী তাদের প্রবেশের পথ করে দেয়, তারা হল জমিদার এবং ধনতান্ত্রিক কৃষকশ্রেণী।

খাদ্য নিরাপত্তা

১৩৪) খাদ্য নিরাপত্তা হল ভারতের গ্রামীণ এবং শহর এলাকার অবস্থিত জনগণের তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মূল বিষয়। এ বিষয়কে ত্রিমাত্রিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ প্রাপ্যতা, প্রাপ্তি এবং ভোগ। স্থূলভাবে বিবেচনায় প্রাপ্যতা হল উৎপাদনের, মজুতের এবং মোট আমদানির বিষয়। স্থানীয় স্তরে তা সূক্ষ্মভাবে নির্ভর করে পরিবহন পরিকাঠামো এবং বাজার সমন্বয়ের উপর। খাদ্যের অধিকার প্রথমত নির্ভর করে ক্রয় ক্ষমতার উপর, এবং তা ঘনিষ্ঠভাবে উৎপাদন সামগ্রী যোগাড় এবং জীবিকা অর্জনের সুযোগের সাথে সংযুক্ত। পরিবারের মধ্যে এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের ভেতর প্রাপ্তিকে বুঝতে হয় লিঙ্গ অসমতার বৈশিষ্ট্য দিয়ে। ভোগের সার্থকতা সূক্ষ্মভাবে নির্ভরশীল যথাযথ শৌচ ব্যবস্থার সুযোগ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধার উপর, যেখানে খাদ্য গ্রহণের শরীরবৃত্তীয় প্রয়োগের নিশ্চয়তা থাকে।

১৩৫। খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি মাত্রার সব কয়টির উপর নয়া উদারিকরণনীতির মারাত্মক প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে ১৯৯৭ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে। খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা, স্থূল পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্যতার নকল রূপ ১৯৯৪- ৯৫ এবং ২০০৪-০৫ সময়ের মধ্যে মাথাপিছু পরিমাণে নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছে, যেমন, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে ০.৭ শতকরা হারে, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১.৬ শতাংশ হারে। গণবণ্টন ব্যবস্থার উঁচু মাত্রায় দাম বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানে ধীরগতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি, শক্তি এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সেবা কাজের ভরতুকিতে কোপ, প্রাপ্যতার মাত্রা এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভরতা এ সময়ে আরও বিপর্যস্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত, বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য অপেক্ষাকৃতভাবে সরকারি বিনিয়োগ কমানো এবং সরকারি খরচ হ্রাস করার ফলে পানীয় জল এবং শৌচাকারের

সুযোগের উপর আঘাত এসেছে, অথচ এগুলো ভোগ করার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারত।

১৩৬) ২০০৪-০৫ সাল থেকে খাদ্য নিরাপত্তা অভিযান কিছুটা ভিন্ন রকমের। প্রথমত, প্রাপ্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০০৬-০৭ এবং ২০১১-১২ এর মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন এবং সংগ্রহ দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে খরার জন্য ২০০৯-১০ সালটি ব্যতিক্রম। যদিও ২০১১-১২ সাল থেকে ২০১২-১৩ সালে ২৫৯ মিলিয়ন টন থেকে ২৫০ মিলিয়ন টনে নেমে আসে, ২০১৩-১৪ সালে অনুমিত ফলন হয় ২৬৩ মে. টন। ২০০৬-০৭ সালের পর থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে খাদ্যের প্রাপ্যতা মোটের উপর বেড়ে চলছিল। মাথাপিছু খাদ্য শস্য প্রাপ্যতা, যা ১৯৯৪- ৯৫ এবং ২০০৪- ৫ এর মধ্যে নেমে যায়, তা ২০০৫ সালে বেড়ে যায় ৪২২.৪ গ্রাম থেকে ৪৬২.৯ গ্রামে । তা নমনীয় বৃদ্ধি এবং পূর্বের দৈনিক ৫০৪ গ্রাম থেকে অনেক নীচে।

১৩৭। খাদ্য নিরাপত্তার 'প্রাপ্তি' মাত্রাতেও কিছু উন্নতি ঘটেছিল। ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট পাশ হওয়া এবং এন আর ই জি এস এর মাধ্যমে এই আইনের প্রয়োগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেমনি করে ২০০৩-০৪ এবং ২০০৭-০৮ এর মধ্যবর্তী সময়ে আর্থিক বৃদ্ধির হারও দ্রুততর হয়।

১৩৮) তিনটি ন্যাশনাল ফেমিলি হেলথ সার্ভে রাউণ্ড (১৯৯২-৯৩, ১৯৯৮-৯৯, ২০০৫-০৬) থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পুষ্টিসাধনের সূচক অনুসারে তেমন লক্ষণীয় কোন উন্নতি এ সময়ে হয়নি; যেমন ৫ বছর বা এর চেয়ে কম বয়সিদের রক্তাল্পতা বা বয়স অনুসারে ওজনের স্বল্পতা অথবা ১৩ থেকে ৪০ বছরের মহিলাদের রক্তাল্পতা বা দুরারোগ্য শক্তিহীনতা বিবেচনায়। কিন্তু ২০০৫-০৬ সালের পর আমাদের হাতে এমন তথ্য নেই। মাত্র দু'টি সূচক সম্পর্কে সরকারি তথ্য পাওয়া যায়— বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছে এমন পরিবারের অনুপাত এবং টয়লেটের সুযোগ পাচ্ছে এমন পরিবারের অনুপাত। ২০০১ এবং ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই দু'টো উপকরণের সূচক কিছুটা ভাল হলেও তাকে নিয়ে উল্লাসের কোন বিষয় নেই। কারণ ভারতের বেশিরভাগ জনগণ পুষ্টিলাভের ক্ষেত্রে ভয়াবহ অবস্থানে রয়েছে।

১৩৯) নয়া উদারনৈতিক সংস্কারজনিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারেনি। যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে, তা হল খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে বাম রাজনৈতিক শক্তিসমূহের এবং অন্যান্যদের চাপের দরুণ সরকারি খরচ বৃদ্ধি এবং রাজ্য সমূহের হস্তক্ষেপের ফল। পুষ্টি সাধনের ক্ষেত্রে যে ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে তাতে দেখা

যায় শিশু, মহিলা, দলিত এবং আদিবাসী জনগণ এবং মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট বঞ্চনা রয়েছে। খাদ্য এবং পুষ্টির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রচার ও বিক্ষোভ কর্মসূচী এবং গণআন্দোলন জারি রাখতে হবে এবং তার মধ্যে সামাজিক ও লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৪০) জনপ্রিয় সংগ্রামগুলি সরকারকে জনগণের জন্য কিছু কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য করেছে, যেমন এম এন আর ই জি এ এবং বনাধিকার আইন থেকে প্রসূত কার্যক্রম। জনগণের চাপ মিড-ডে-মিল স্কীম এবং আই সি ডি এস- এর কিছুটা প্রসার ঘটাতে পেরেছে। এই দৃষ্টান্ত-গুলিতে জনগণের জমায়েত করার সুযোগ রয়েছে এই নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য যে, তাদের এই সুযোগগুলি যেন বহাল থাকে এবং আরও রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটে। একইভাবে কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিজ্ঞান যোজনা, এগ্রিকালচারেল টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি, ন্যাশনাল রুরাল লাইভ্‌লি হুড মিশন, ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি মিশন এবং এক গাদা অন্যান্য স্কীম এবং প্রোগ্রাম সংগ্রামের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করছে। এই সংগ্রামের লক্ষ্য হল, কৃষকেরা এবং গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকেরা এগুলোর সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বিধান করা। এই স্কীমগুলো রাজনৈতিক জমায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হবে, যদি আমরা যথোপযুক্তভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারি।

১৪১। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষককে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল তাদের পরিমাপের ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করা। এটা মনে রেখেই উৎপাদনের ময়দানে, প্রক্রিয়াকরণে, মূল্য সংযোজন (ভেলু এডিশন) এবং মার্কেটিং- এ এস এইচ জি এবং সমবায় সমিতি গঠন, যেখানেই বাস্তব এবং অনুকূল অবস্থা আছে, সেখানেই সেগুলোর উদ্ভাবন ঘটাতে হবে। বিজ্ঞান-বান্ধব সুলভ কথোপকথনের মাধ্যমে ফার্মের কাজকর্ম বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

দারিদ্র্য

১৪২। ভারত সরকার দারিদ্র্যের আয় নির্ধারণের জন্য ভোগের খরচকে ব্যবহার করে, আয়কে ধরে না। তাই ভারতে দারিদ্র্যের হিসেবের ভিত্তি হল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞায় একটা ভদ্রস্ত জীবন যাপনের সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় না, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তাকেও বিবেচনা করে না। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীতে দারিদ্র্য নিরূপণের উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগে কল্যাণকর কর্মসূচী স্থির করার জন্য দারিদ্র্যের দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা অনুধাবন করা হত। বর্তমানে সেই প্রবণতা বিচার্য বিষয় নয়। এখন কল্যাণকর কর্মসূচীর জন্য বিবেচনা করা হয়— কত তহবিল বরাদ্দ করা দরকার এবং উপযুক্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা কত ধার্য করা হবে তা হয় বিচার্য বিষয়। অর্থাৎ দারিদ্র্য নিরূপণের উদ্দেশ্যটাই বদলে গেছে।

দারিদ্র্য নিরূপণের একইরকম আয়ের মাপকাঠি দিয়ে নির্ধারণ করা হয় ভরতুকিতে খাদ্যশস্য পাওয়ার যোগ্যতা, আবাসনের সুবিধাভোগের যোগ্যতা, ভরতুকিতে পারিবারিক বিদ্যুৎ সংযোজনের যোগ্যতা, বা স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা। এই দারিদ্র্য- রেখা নির্ধারণের লক্ষ্য হল বড় অংশকে বহির্ভূত রাখা, অর্থাৎ এটা এমন একটি স্ট্যাণ্ডার্ড, যা বিরাট অংশের জনগণকে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বাইরে রেখে দেবে। দারিদ্র্য রেখা কে ভুল ব্যাখ্যা করে প্রকৃত গরীবকে অস্বীকার করার অবিরাম প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের নীতিগত অবস্থান হল এই যে, দারিদ্র্য- রেখা হচ্ছে দুঃস্থতার লাইন এবং তা এরকম যে, কল্যাণকর কর্মসূচী থেকে যোগ্য সুবিধাভোগী যেন বাদ না পড়ে, সেভাবে হবে দারিদ্র্য রেখা।

১৪৩) নয়া উদারনৈতিক সংস্কারের সময় জুড়ে আয়ভিত্তিক দারিদ্র্যের কোন ধারাবাহিক পতন ঘটেনি। এটা জোর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ যে, বিগত দু'দশক বা আরও বেশি সময় ধরে জিডিপি-র উচ্চহারে বৃদ্ধি সত্ত্বেও গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে অধিকতর ধীর প্রগতি হল সেই নীতির ফল, বা তা গ্রামীণ অসাম্যকে ক্ষুরধার করেছে, অপরদিকে আর্থিক দূরদর্শিতার অভাবের কারণে গরীবমুখী নীতির হস্তক্ষেপ সীমিত করেছে।

১৪৪) এফ এ এস সার্ভে দ্বারা ময়দান থেকে সংগৃহীত তথ্য এই বলে যে, গ্রামের পর গ্রামে গ্রামীণ জনতা, যার মধ্যে কায়িক শ্রমিক এবং গরীব কৃষক পরিবারগুলি আছে, মারাত্মক বঞ্চনার মধ্যে বাস করে এবং তারা যে কোন সভ্য সমাজে অতি দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষা

১৪৫। গ্রাম ভারতের আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতার লক্ষণ হল শিক্ষা ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিরাট অংশের অবিরাম বঞ্চনা। দেশব্যাপী সার্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় শিক্ষা প্রবর্তন করতে যে ব্যর্থতা সাক্ষরিত হয়েছে, তা স্বাধীনতা উত্তর রাষ্ট্রের বিরাট ব্যর্থতা বলে পরিগণিত হচ্ছে। জ্ঞান প্রসারে বাধাদান এবং কুসংস্কার, অনেক সময় যা ভয়াবহ রূপ নেয়, তা গ্রামজীবনের বিভিন্ন দিকে অবিরাম রেখাপাত করে, সাধারণভাবে জনগণের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়, এবং তা হয় সামাজিক অত্যাচারের নিকৃষ্টতম শিকার, বিশেষ করে মহিলাদের তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৪৬। উদারিকরণমূলক সংস্কার প্রাক্- বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে সকল স্তরে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ এবং বাণিজ্যিকিকরণে ঠেলে দিয়েছে। ইউ পি এ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, যৌথভাবে জিডিপি-র ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করবে, কিন্তু তা

রক্ষা করে নি, এমনকি, খরচের চিত্র জি ডি পি-র ৪ শতাংশেও পৌঁছায়নি। শিক্ষার অধিকার কম বা বেশি মিথ্যায় পর্যবেসিত হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে কথা রক্ষা করা বা ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক আইন অনুসারে অগ্রসর হওয়া, কোনটাই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি।

১৪৭) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাক্ষরতার হার, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার, উপস্থিতির হারে এবং বিদ্যালয়ে অবস্থানকারী সময়ের পরিমাণ ইত্যাদি সূচকগুলিতে কিছু অগ্রগতি ঘটেছে, কিন্তু তা হয়েছে ধীর গতিতে। এমন কি জনগণনা, যেখানে সাক্ষরতা উল্লেখ করা হয়, সে অনুসারেও ২০১১ সালে ২৭৩ মিলিয়ন ভারতবাসী নিরক্ষর ছিল। শিক্ষার মানের সূচকের ক্ষেত্রে ধনী বনাম গরীব, বর্ণ হিন্দু বনাম দলিত, আদিবাসী এবং মুসলমানদের স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে এবং শহর ও গ্রাম ভেদে অনেক পার্থক্য রয়েছে। 'ফাউণ্ডেশন ফর এগ্র্যারিয়ান স্টাডিজ' গ্রাম সমীক্ষার যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায় ধনী ৫ থেকে ১০ শতাংশকে বাদ দিলে সারা দেশব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে গণহারে বঞ্চনা করা হয়েছে। যতগুলি গ্রাম সমীক্ষা করা হয়েছে, তাতে অর্ধেক বা তার বেশি মহিলা প্রথামাফিক এক বছরও বিদ্যালয়ে যায়নি। যে ১৪টি গ্রামে সমীক্ষা চালানো হয়েছে, তার মধ্যে একটি গ্রাম বাদে আর কোথাও ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে সার্বজনীনভাবে বিদ্যালয় উপস্থিতির কোন বিষয়ই ছিল না। সংবিধানগত-ভাবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক ৮ বছর শিক্ষার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা অপূর্ণ রয়ে গেছে। না সার্বজনীন সাক্ষরতা, না বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, কোনটাই কোন পরিবারের ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি, শুধু ব্যতিক্রম সর্বাধিক বিত্তবান পরিবার (বেশি সংখ্যা দলিত বহির্ভূত, আদিবাসী বর্হিভূত, অনুন্নত শ্রেণী হিন্দু পরিবার ব্যতিরেকে)।

১৪৮) কয়েক বছর বিদ্যালয়ে গিয়েছে এমন পরিবারের শিক্ষা অর্জনজনিত সমীক্ষাতে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায়, দেশব্যাপী তাদের অবস্থাও বড়ই করুণ। বিগত দু' দশক এবং এর বেশি সময়ে জি ডি পি-র বৃদ্ধির যে উচ্চ হার চলছে, তার কোন লক্ষণীয় প্রতিফলন শিক্ষার বঞ্চনা অবসানের উপর পড়েনি, বিশেষ করে, শোষিত শ্রেণীগুলির উপর, অত্যাচারিত সামাজিক গ্রুপগুলির উপর, এবং গ্রামীণ মহিলাদের উপর। শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শিক্ষার বঞ্চনা লাঘব করাই গ্রামীণ এলাকায় আমাদের কাজের মুখ্য বিষয় হওয়া দরকার।

১৪৯) কিছু রাজ্যের তথ্য, যেমন তামিলনাড়ু, থেকে দেখা যায়, সরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি হ্রাস পাচ্ছে। যেসব বেসরকারি বিদ্যালয়ের মান অনিশ্চিত, অথচ অর্থ খরচ রীতিমত বেশি, সে সব বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে অভিভাবকরা উৎসাহী। পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে এবং উত্তম শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক

যোগান দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের অবশ্যই এই শ্লোগান সামনে নিয়ে আসতে হবে, "সরকারি বিদ্যালয়ের শক্তি বাড়াও, উত্তম শিক্ষা সুনিশ্চিত কর"।

১৫০। নিরর্থক বাণিজ্যিকিকরণ, বেপরোয়া কেন্দ্রিভবন এবং অবাধ দুর্নীতির অন্যতম শোচনীয় শিকার হল উচ্চ-শিক্ষা। মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (এম সি আই) এবং এ আই সি টি ই (অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন) এর ভেতর থেকে এবং নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হয়ে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা নিয়ে যে কাঠামোগুলি বাইরে আসে তাদের জন্য বিশাল অঙ্কের ফি দিতে হয় এবং এ জন্য ছাত্র শিক্ষক এবং কর্মচারীর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। ফলে অনেক বেশি খরচে খুব কম শিক্ষা পাওয়ার ঘটনা হল ইস্যু, যা গ্রামীণ পরিবারগুলিতে প্রভাব বিস্তার করে। এ বিষয়গুলিকে মোকাবেলা করাই আমাদের পার্টির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

১৫১) গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার বঞ্চনার স্তর, শিক্ষায় পর্যাপ্ত সরকারি খরচ বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের অনিচ্ছা, এমনকি বিদ্যালয় শিক্ষার খরচের দ্রুত বৃদ্ধির দরুণ পকেট খালি হয়ে যায় এবং সরকারি বিদ্যালয়, নিয়ন্ত্রণ মুক্ত সরকারি ও বেসরকারি সুযোগ দাতাগণ বহাল রয়েছেন, এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ এলাকায় পার্টি এবং গণসংগঠনসমূহকে অবশ্যই শিক্ষা বিষয়ক ইস্যুগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বঞ্চিত ও সামাজিকভাবে অত্যাচারিত শ্রেণীগুলিকে আরও উন্নত শিক্ষা পদ্ধতির দাবিতে সংগঠিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক

১৫২) এ সময়ের মধ্যে জন্মের ভিত্তিতে জীবনের পরমায়ু, শিশু মৃত্যুর হার এবং মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত, এই সূচকগুলির উন্নতি ঘটেছে। তবে সূচকগুলির মানের উন্নতির ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে পার্থক্য আছে, (বাসস্থান, শহর বনাম গ্রাম ভিত্তিতে, এবং লিঙ্গভেদের ভিত্তিতে পার্থক্য রয়েছে)। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ভেদেও লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে, যদিও এই পার্থক্য-সমূহের সঠিক তথ্য এখন হাতের কাছে নেই।

১৫৩) নয়া উদারনৈতিক সময়ের মধ্যে সরকারি উদ্যোগে সুযোগ ও পরিষেবার কিছু সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রয়োজনের তুলনায় এবং সম্পদ সংগ্রহ করার যে সম্ভাবনা বিরাজ করছে, সে তুলনায় সম্প্রসারণ অপ্রতুল, কারণ, বুর্জোয়া জমিদার সরকার সে সুযোগ গ্রহণ করেনি। ইউ পি এ ১ নং সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য খাতে সম্মিলিত খরচ জি ডি পি-র ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২ এবং ৩ শতাংশের মধ্যে নিয়ে আসবে, তা অপূর্ণ রয়ে গেছে, যদিও নয়া উদারনীতির সময়ে স্বাস্থ্যের উপর সামগ্রিক ব্যয়ের

স্তরের বৃদ্ধি ঘটেছে।

১৫৪) নয়া উদারিকরণের যুগে সরকারি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসূচক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং সুবিধা প্রসারের প্রশ্নে অগ্রগতির স্বীকৃতির দ্বারা স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক লক্ষণগুলো কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করা বোঝায় না। নয়া উদারনীতির একটি মূল ফল হল পরিবারপিছু স্বাস্থ্য খরচ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যসেবার আনুষঙ্গিক সুযোগ গ্রহণে এবং তার বর্ধিত ব্যয়ের অংশগ্রহণে পরিবারসমূহের মোট আয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় গরীব পরিবারগুলি প্রচন্ডভাবে অর্থনৈতিক আঘাত পেয়েছে। তা ছাড়া, যে কোন ধরনের স্বাস্থ্য বীমার সুযোগকে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুসারে গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে যারা পকেট খরচে হাসপাতালের বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা পায় তেমন ২০০৫ সালের রোগীর সংখ্যা ৬১ শতাংশ থেকে ২০১১ সালে ৭৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

২০০০ এবং ২০১২ সালের মধ্যে এই ধরনের দরিদ্রতম ২০ শতাংশের গ্রামীণ পরিবারের পকেট খরচে স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় ৬১ শতাংশ থেকে ৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে, তপশিলী জাতির ক্ষেত্রে তা উঠেছে ৫৮ শতাংশ থেকে ৭৬ শতাংশ এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে ৬৭ থেকে ৮৩ শতাংশে। স্বাস্থ্যের জন্য গ্রামীণ পরিবারের প্রতি সদস্যের মাসিক খরচ ২০০০ সাল থেকে ২০১২ সালে ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই খরচ দ্রুত বেড়ে চলেছে। স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় বৃদ্ধি, সামগ্রিকভাবে এবং পারিবারিক খরচের অংশ হিসেবে এই উভয় প্রকারেই, ব্যয় বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত কৃষক, কায়িক শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র কারিগরদের পরিবারবর্গ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে।

এ বিষয়টা গ্রামে এবং শহরে গরীব অংশের মধ্যে কর্মরত আমাদের গণসংগঠনগুলি জন- জমায়েতের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

১৫৫) বর্তমান নীতি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও সঙ্কুচিত করেছে। পানীয় জল, শৌচাগার এবং পুষ্টিসাধনের সুযোগের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ভয়ানক অপ্রতুল। প্রাথমিক, প্রতিরোধমূলক এবং উন্নত স্তরের স্বাস্থ্যসেবার জন্য এবং জাত- পাত, লিঙ্গ-ভেদ, গ্রাম-শহর এবং আঞ্চলিক অসাম্যগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের গণমুখী প্রচার চালাতে হবে।

পরিবারভিত্তিক সুবিধাদি

১৫৬) ১৯৪৮ সালে মানব অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে। "প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী স্তরের জীবন যাপনের অধিকার এবং প্রত্যেকেই নিজের

এবং তার পরিবারের মঙ্গল সাধনের অধিকার আছে।" বর্তমানে গ্রামীণ ভারতে আবাসনের যে অবস্থা তা এ অধিকারকে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করেছে। ২০১১ সালের জনগণনায় ৬৫ মিলিয়ন গ্রামীণ বাড়িতে বাড়ি ছাদ ছিল কাঁচা ছাদের কাঠামো বিশিষ্ট, ৭৯ মিলিয়ন ছিল কাঁচা দেওয়াল, ১০৬ মিলিয়ন ঘর ছিল কাদামাটির মেঝে বিশিষ্ট। দলিত, আদিবাসী এবং মুসলিমদের পরিবারগুলির অবস্থা অন্য সামাজিক গ্রুপগুলির তুলনায় অধিকতর করুণ অবস্থা। ৯৫ মিলিয়নের অধিক গ্রামীণ পরিবার ঘনবসতি পরিবেশে রয়েছে, অর্থাৎ প্রতি কক্ষে দু'জনের বেশি থাকে এই পরিমাপের ঘর, যা আন্তর্জাতিক লেবার অফিস প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য সুপারিশ করেছে সে রকম কক্ষে রয়েছে।

১৫৭) একটি বাড়ি বলতে শুধু একটি ছাদ এবং চার দেয়াল বোঝায় না, এছাড়াও থাকবে টয়লেট, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ। ৬টি রাজ্যের ১৫টি গ্রামে চালানো হয়েছিল সমীক্ষা, যাতে এই মাপকাঠিগুলি বিদ্যমান ছিল —পাক্কা ছাদের বাড়ি, দেওয়াল এবং মেঝে দুই কক্ষ বিশিষ্ঠ, ভেতরে অথবা বাড়ির ঠিক বাইরে জলের উৎস, বিদ্যুৎ, একটি কর্মরত শৌচাগার। যে গ্রামগুলি সমীক্ষা করা হয়েছে, তাদের ৯৪ শতাংশ যেখানে দলিত পরিবার বাস করে, ৯৬ শতাংশ বাড়ি যেখানে মুসলিম পরিবার থাকে, ১০০ শতাংশ বাড়ি যেখানে আদিবাসীরা থাকে, যেখানে নির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুসারে ঘরবাড়ি হয়নি। অন্যান্য সামাজিক গ্রুপগুলির মধ্যে ৭৮ শতাংশ পরিবার, এমন সব ঘরে থাকে যেখানে কক্ষগুলি এ পরিমাপে হয়নি, সংক্ষেপে পর্যাপ্ত আবাসনের কথা বলতে গেলে, স্বাস্থ্য ও মঙ্গল করা জীবনের জরুরি যে প্রয়োজনীয়তা, সে ক্ষেত্রে ও চিত্রটি বড় আকারের এবং সার্বজনীন বঞ্চনার মত।

জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি এবং গ্রামীণ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

১৫৮) কৃষির ক্ষেত্রে একটি নতুন এবং তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বেগের উৎস সৃষ্টি হয়েছে জলবায়ু সম্পর্কিত আতঙ্ক থেকে। এটা কৃষির উৎপাদনের উপর সামগ্রিকভাবে এবং কৃষকের জীবনের এবং বিশেষ করে গ্রামের কায়িক শ্রমদানকারী মজুরদের এবং তাদের জীবন-জীবিকার উপর ভয়ানক প্রতিকুল প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ফল হতে পারে চরম জলবায়ুঘটিত বাড়তি ঘটনাবলী অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অধিকতর ভয়াবহতা। এগুলি পৃথিবীর কোন কোন অংশে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতোমধ্যে ঘটতে শুরু করেছে।

১৫৯) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল অসংখ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে কৃষি উৎপাদনের উপর ঘটতে পারে, যার মধ্যে থাকছে আর্দ্রতা প্রাপ্যতা, জীবাণু, আগাছা, পুষ্টির প্রাপ্যতা। এসবের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কৃষি উৎপাদনের উপর। গম উৎপাদনের মরশুমে তাপমাত্রার

২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি তাকে সংক্ষেপিত করছে, যার ফল হল প্রতি হেক্টরে ৭৫ টন উৎপাদন হ্রাস। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে অনুরূপ ফল ঘটছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে দেশের বিভিন্ন অংশে চলছে, যা হোক, এখন পর্যন্ত ভারতের মৌসমী ঋতুতে ৮ ডিগ্রি থেকে ১.২ ডিগ্রি পর্যন্ত। বিশ্বব্যাপী উত্তাপনের বড় রকমের কোন প্রভাব পড়ে নি। দেশের আবহাওয়া দপ্তরের ৩৬টি মহকুমার ৩টিতে বৃষ্টিপাতের নমুনার কিছু স্থানীয় পরিবর্তন এবং সমগ্র মৌসুমী বরষাতে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৬০) ভারতের কৃষি উৎপাদনের উপর কি ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাব দেখা গিয়েছে? প্রধানত উত্তর হচ্ছে— না। অবশ্য, এই প্রভাব দেখা গিয়েছে অল্প কিছু ক্ষেত্রে। যেহেতু নিম্ন উচ্চতার জেলাগুলিতে শীতকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে,তাই হিমাচল প্রদেশের অধিক উচ্চতর জেলাগুলিতে আপেলের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে। নীচের জেলাগুলিতে শস্যের উৎপাদনশীলতা এবং তার মান হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জলাশয়ভিত্তিক পোনামাছের চাষ, ডিম ছাড়ার ঋতু লক্ষণীয়ভাবে দীর্ঘ হয়েছে, অন্তত এক মাসের বেশি হয়েছে, যার ফলে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, তা ঘটেছে গ্রীষ্ম শুরুর আগের তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন। তবে তাপমাত্রা আরও বেশি বৃদ্ধি পেলে গ্রীষ্মকালে ক্ষতিসাধন করবে। জলবায়ু পরিবর্তন পাঞ্জাব, হরিয়াণা ও উত্তর প্রদেশের রবি শস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ব্যাহত করতে ভূমিকা নেবে।

১৬১) কৃষি অর্থনীতিতে বর্তমান সময়ে যে উৎপাদন সম্পর্ক বহাল আছে, তাতে জলবায়ু সম্পর্কিত ব্যতিক্রমী অবস্থা ভূস্বামী ও ধনী কৃষকের চেয়ে ক্ষুদ্র চাষীদের অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। একইভাবে ক্ষতিসাধন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়। কৃষকের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তব প্রভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করার সময় আমরা এ সত্যকেও অবশ্যই আলোকপাত করব যে, এই সমস্যার সমাধান লুক্কায়িত আছে কৃষি সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের এবং কৃষকের জন্য প্রভূত সরকারি সাহায্যের মধ্যে।

১৬২) ক্ষুদ্র আকৃতির কৃষি দিয়ে স্থিতিশীল কৃষির পরিচয় মিলে না। ক্ষুদ্র উৎপাদনকে অধিকতর উপযুক্ত বা পরিবেশগতভাবে অধিকতর স্থায়ী বলে অতিরঞ্জিত করা যাবে না। যখন উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ও বর্ধিত বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে কৃষিতে উৎপাদন শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তখন যে কোন ধারণা কৃষকের উৎপাদনের নির্ভরতা এবং পরিবেশগত সংরক্ষণ এই উভয়কে স্থিতিশীল কৃষির জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থিতিশীল কৃষির এই বোঝাপড়া গাড্‌গিল এবং কস্তুরিরঙ্গম কমিটি যে ইস্যু উত্থাপন করেছে তাই আমাদের গতিকে নির্দেশ দিবে।

১৬৩) যখন আগেকার সময়ও দুর্যোগ এবং ধ্বংস কার্য ঘটেছে, তখন জলবায়ু পরিবর্তন চরম ঘটনা ঘটার যে সম্ভাবনা লক্ষণীয়ভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, তা গ্রামীণ ধ্বংস কার্য প্রতিরোধকে আরও জরুরি করে তুলেছে। কৃষি উৎপাদনের উপর এ সকল দুর্যোগ — প্রাকৃতিক, বা মনুষ্যসৃষ্ট — এর ফলাফল, এবং যেভাবে গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন অংশ প্রভাবান্বিত হয়, তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে চলমান অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতিসমূহের উপর নির্ভর করে। ভারতে এক বন্যার ঘটনা গড়ে প্রতিবছর ৩২.৪৩ মিলিয়ন মানুষের ক্ষতির করে (কেন্দ্রীয় জল কমিশন থেকে ১৯৫৩ হতে ২০১১ সালের মধ্যে)। যে এলাকা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার আয়তন ৭.২২৫ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে প্রতিবছর ৩.৭৮৯ মিলিয়ন হেক্টর শস্য নষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি শস্য এলাকা ক্ষতি হয়েছিল ২০০৫ সালে, ১২ মিলিয়ন হেক্টর বন্যার কবলে পড়েছিল। আরও অনেক ক্ষতির সূচকের জন্য ১৯৭০ দশকের শেষ দিকে যেতে হয়, যখন মোট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা, জীবনহানির সংখ্যা, গবাদি পশুর হারিয়ে যাওয়ার সংখ্যা এবং ধ্বসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের সংখ্যা, সবই শীর্ষস্থানে ছিল। এতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, যখন প্রাণহানি এবং গবাদি পশু এবং অন্যান্য ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়, তখন শস্য উৎপাদনের ক্ষতি হয় অধিক পরিমাণে।

১৬৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি সামলানোর প্রশ্নে এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষতি পর্যাপ্ত পরিমাণে পূরণ করার ক্ষেত্রে ভারতের রেকর্ড ক্ষীণ। কৃষিতে ক্ষতির ক্ষেত্রে যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত নয়। অধিকন্তু ভাগচাষীদের ক্ষতিপূরণ ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করা হয়। সাধারণভাবে গ্রামীণ শ্রমিকদের যে মজুরি নষ্ট হয়, তা পূরণের কোন ব্যবস্থা হয় না। গরীব এবং মাঝারি কৃষক ও গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আনুপাতিক নির্বিচারে দুর্ভোগ ভোগ করে।

১৬৫) জাতীয় নমুনা সমীক্ষা তথ্য একথা বলে যে, নদীর দু'কুল যখন জলে উপছায়ে পড়ে, বা সমুদ্রের জল যখন ফুলে উঠে, গ্রামীণ ঘরবাড়িগুলো তখন বন্যায় ভেসে যায় সকল অনুমান ছাড়িয়ে, ঘরগুলোর ভিটির উচ্চতার অনুমান ছাড়িয়ে। ঘরগুলোর ভিটির উচ্চতা অতিসামান্য বা প্রায় শূন্য হবার ফলে এসব ঘটনা গ্রামীণ এলাকায় বেশি ঘটে। তাই বন্যার প্রকোপও সঙ্গত কারণেই বেশি। যে সকল পরিবার খুবই নিম্ন আয়ের পর্যায়ে, তারা এসব বন্যায় সবচাইতে বেশি দুর্ভোগ ভোগ করে।

১৬৬) এ সকল বিপর্যয়ে ত্রাণের যে ব্যবস্থা আছে, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং ঝুঁকি প্রতিরোধের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা গ্রামীণ জনগণের জন্য একেবারে উদ্বেগজনক। যা হোক, এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, গরীবের উপর বিপর্যয়ের বেসামাল ঘটনা, যা গ্রামাঞ্চলে ঘটে

থাকে, তাদের দুর্যোগের কারণটা শুধুই পরিবেশগত, এমনটা ভাবার কারণ নেই। পক্ষান্তরে, ঘটনা হলো, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক অবস্থাই গরীবের উপর এই অপরিমিত দুর্দশা নামিয়ে আনে।

১৬৭) এই দুর্যোগের সময়ে আমাদের জনগণের সাথে থাকতে হবে এবং যথাসাধ্য সহায়তা দিতে হবে। আমরা অবশ্যই কার্যকরভাবে প্রচার চালাব এবং এই বিষয়টা বোঝাবার জন্য জনগণকে আমাদের শিক্ষা দিতে হবে যে, ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় ও গরীব মানুষের উপর তার প্রভাবের সঙ্গে নয়া উদারনীতির একটি সংযোগ রয়েছে যা সমাধান করা, প্রতিরোধ করা এবং পরিবেশগত উদ্বেগ সম্বরণ করার দিকে সরকারের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

সংক্ষেপে সার এবং উপসংহার

১৬৮) ভারতের কৃষি- সংশ্লিষ্ট শ্রেণীসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন সমূহ বিবৃত করা এবং এগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে এই রিপোর্টে, বিশেষ করে, ১৯৯১ সালে উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী নীতিসমূহ দ্রুত প্রবর্তনের পর যা ঘটেছে, সেগুলো সম্পর্কে।

১৬৯) আমরা প্রথমে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি, সে সব প্রধান পরিবর্তনসমূহ, যা ঘটেছে নয়া উদারনৈতিক নীতির শাসনে (প্যারা ৪)।

উৎপাদন শক্তিসমূহ

১৭০) রিপোর্টে এর পর আলোচনা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন শক্তির সাম্প্রতিক পরিবর্তনের বিষয়সমূহ (প্যারা ৬ থেকে ১০)। এই অংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (এবং রিপোর্টে সর্বত্র যে ধারণা বিরাজ করেছে) হলো এই যে,কৃষির সঙ্কট বর্তেছে শ্রেণীতে, শস্যে, অঞ্চলে এবং সময় ভেদে। সর্বোপরি তা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে পুরো সময় জুড়ে গরীব এবং মাঝারি এবং কায়িক শ্রমিকদের। বিস্তৃত বলতে গেলে, তথ্যগুলি ধরিয়ে দেয়, উদারনীতির প্রথম পর্যায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সাল, যখন নতুন নীতি- প্রয়োগের ধাক্কা সূচিত হয়েছিল। ১৯৯৭ থেকে ২০০৪ সাল হল অর্থনীতি এবং জনগণের উপর উদারিকরণ নীতির নিকৃষ্ট প্রতিফলন, যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্যের নিম্নগামিতা গ্রামাঞ্চলে নজিরবিহীন সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল, তা যুক্ত হয়েছিল পূর্ববর্তী সময়ের নীতি পরিবর্তনের নেতিবাচক ফলের সাথে (ব্যঙ্গ করে বলা যায়, বিজেপি তাকে "উজ্জ্বল ভারত" আখ্যা দিয়েছিল)। ২০০৪

সালের পর কৃষির সূচকগুলির কিছুটা পুনরুত্থান ঘটে এবং বামপন্থীদের চাপের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটে। ২০০৪ সালের পরবর্তী বৃদ্ধি, সামগ্রিকভাবে ঘটে অসম বৃদ্ধি, যার বৈশিষ্ট্য হল গ্রামাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের তীব্র এবং বর্দ্ধিষ্ণু অসমতা প্রকাশ পাওয়ার ঘটনা।

শ্রেণী কাঠামো

১৭১) এর পর আমরা পৃথকভাবে আলোচনার জন্য ভারতের গ্রামাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করি।

১৭২) গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের বিকাশ অসম — এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ বস্তুত বিকট রূপ নিয়েছে বিশ্বায়ণের যুগে, এবং যদিও কৃষি- বিষয়ক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল, মান্ধাতার আমলের আকৃতি, সামাজিক কাঠামো বর্তমান সময়ে সম্প্রসারিত হয়েছে, এসময়ের বাহিত রূপ হয়েছে গ্রামীণ ভারতের ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণ এবং ঘনীভবন।

ভূস্বামী এবং বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষক

১৭৩) ভূস্বামী এবং বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষক শ্রেণীকে আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতাধরের গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে সনাক্ত করেছি। এই শ্রেণীর দুটো প্রধান উপাদান রয়েছে। প্রথম উপাদান হল তারা জমিতে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে যাদের অবস্থানের প্রাথমিক উদ্ভব ঘটেছে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে, যার সম্পর্ক রয়েছে জমি এবং মর্যাদার সঙ্গে (অর্থাৎ যারা ঐতিহাসিকভাবে ভূস্বামী পরিবারভুক্ত্য), দ্বিতীয় উপাদান হল তারা, যারা ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের সুবিধাভোগী এবং যাদের বর্তমান অবস্থান উদ্ভূত হয়েছে গ্রামীণ ভারতে উৎপাদন শক্তি বিকাশের দ্বারা। এই দুটি অংশ— পুঁজিতান্ত্রিক জমিদার এবং বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক কৃষক— একীভূত হওয়ার প্রণালীতে আছে (প্রকৃতপক্ষে, গ্রাম এলাকায় একীভূত হয়ে একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়ে গেছে)। এই শ্রেণীটি ভারতের গ্রামের অধিকাংশ জমি এবং সর্বোৎকৃষ্ট জমির মালিক। যেখানে প্রাথমিক অবস্থায় জমির মালিকানা এবং জমির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকার সুবাদে এই শ্রেণী ক্ষমতায় অধিকারী হয়েছিল, বর্তমানে তারা তাদের সম্পদ এবং অবস্থান অর্জন করেছে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ উৎসসমূহ এবং নিকটবর্তী শহর এলাকা থেকে। যেমন, পশু, সম্পদ, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের পরিকাঠামো (এগ্রো প্রসেসিংসহ), সুদের ব্যবসা, বাণিজ্য, বেসরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা, নির্মাণকার্য, জমির ব্যবসা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী। এগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার

করে, এগুলিকে নিজেদের সুবিধামত বদলিয়ে যেতে বাধ্য করে, এবং বুর্জোয়া রাজনৈতিক কলাকৌশলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে কৃষি বহির্ভূত গ্রামের এবং উপনগরীর সর্বাধিক ধনী স্তরের সাথে এবং তাদের সাথে এরা সমাপতিত হয়ে পড়ে (এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখুন প্যারা ১৫ থেকে ২৭)।

১৭৪) এটা ঘটনা যে, জমি এখন ভূস্বামী ও বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক কৃষকশ্রেণীর কাছে একমাত্র আয়ের এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উৎস নয়, এমন কি প্রধান উৎসও নয়, ফলে তাদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বণ্টন করে দেয়ার বিষয়টি আমাদের আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হতে পারে। কি পদ্ধতিতে এমন শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যায়, তা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। গ্রামের ব্যাপক পরিসরের অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহের উপর (তবে একচেটিয়াভাবে বা প্রধান স্থানীয় গ্রাম-ভিত্তিক শোষণ নয়) জমিদার এবং বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক কৃষকের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এই পরিস্থিতিই তাদেরকে প্রভুত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা এনে দিয়েছে (তবে একচেটিয়া বা মুখ্য গ্রাম- ভিত্তিক শোষন নয়)। এ অবস্থায় এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে আমরা একাকী জমি সংক্রান্ত সংগ্রাম করতে পারব না। জমির বিষয়টি কেন্দ্রীয় বিষয় ধরে এবং বিস্তৃত ভূমি সংস্কারের দাবির গুরুত্বকে স্বীকার করে সিলিং বহির্ভূত জমি চিহ্নিত করা, উদ্ধার করা এবং পুনরায় বণ্টন করা, এই দাবিও সহসা আদায়যোগ্য দাবি হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে না। তার কারণ এলাকাভেদে বিবিধ এবং তা বিষয়গত ও বিষয়ীগত। (প্যারা ২৮ থেকে ৩০)।

কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিক

১৭৫। কৃষি বা কৃষি বহির্ভূত ভাড়াটে মজুর শ্রমিকেরা গ্রামীণ কায়িক শ্রমিকদের বিরাট শ্রেণীতে পরিণত করেছে। এ সম্পর্কে রিপোর্টের প্রধান পয়েন্টগুলি এরকম :

প্রথমত: কৃষিতে ভাড়াটে শ্রমিক এবং অকৃষি ক্ষেত্রের ভাড়াটে শ্রমিকের কাজ এখন গ্রামীণ শ্রমিক হিসেবে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। কৃষিক্ষেত্রের মজুর শ্রমিকেরা ব্যাপক হারে ফার্ম-বহির্ভূত কাজেও নিযুক্ত থাকে, এর মধ্যে শহরের পরিযায়ী শ্রমিকেরাও আছে। (প্যারা ৩২ থেকে ৩৫)। তৎসত্ত্বেও গ্রামীণ মজুরদের আংশিক কৃষিসংশ্লিষ্ট এবং গ্রাম্য চরিত্র বহাল রয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে তারা শহরের সর্বহারা শ্রমিক থেকে পৃথক। (প্যারা ৫৪) দ্বিতীয়ত: গ্রামীণ এলাকার মজুরির পরিমাণও সম্পূর্ণভাবে কম। তা চিহ্নিত হয়েছে বৃহদাকারের আঞ্চলিক পার্থক্য এবং স্পষ্ট লিঙ্গভেদের দ্বারা (প্যারা ৫২ এবং ৫৩)। তৃতীয়ত: গ্রামীণ- শ্রমিকদের জন্য প্রকৃত গড় কাজের দিন খুবই কম, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে। (প্যারা ৪১ থেকে ৫১)

চতুর্থত: নিম্নহারের মজুরি, প্রকৃতপক্ষে অপ্রতুল মাথাপিছু কর্মসংস্থানের দিন সংখ্যা, সব কিছু মিলিয়ে কায়িক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের স্তরে এবং বঞ্চনার মাত্রায় বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

১৭৬) আমাদের পরামর্শ হল, পার্টিকে গ্রামীণ শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। এ ধরনের ইউনিয়ন হবে গ্রামাঞ্চলের সকল প্রকার এবং সকল পেশার শ্রমিকদের নিয়ে, যাতে থাকবে বিষয়বস্তুর রকমারি সমাহার — জীবিকার প্রকারভেদ, জীবন ধারনের মান, মজুরি এবং কর্ম সংস্থান, বর্ণ সম্প্রদায়, এবং অন্যান্য সমাজ-বর্হিভূত এবং নিপীড়নমূলক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্তি। এই সংগ্রামগুলি গ্রাম এলাকায় অবস্থিত রাষ্ট্রের কর্ণধার ও প্রধান প্রতিনিধিবর্গ, অর্থাৎ ভূস্বামী ও বৃহৎ ধনতান্ত্রিক কৃষকের এবং গ্রামের অন্যান্য ধনিকবর্গের সাথে শ্রমজীবীদের সম্মুখ সংঘাতে দাঁড় করাবে। (প্যারা ৫৪ থেকে ৬৫)।

১৭৭) কৃষককুল একটি একক সমস্বত্ব শ্রেণী নয়। রিপোর্টে, কৃষক শ্রেণীসমূহকে কিসের উপর ভিত্তি করে পৃথকিকরণ করা হবে, সেই মাপকাঠিগুলিও আলোচনা হয়েছে (প্যারা ৫৭ থেকে ৬১)। কৃষকের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরিবর্তনের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য চিত্র আমাদের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ যোগান হিসাবে রেখাপাত করে। প্রথম, একটি বিরাট অংশের কৃষক গৃহস্থ পরিবারবর্গ তাদের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ উপার্জন করে ফার্ম বহির্ভূত উৎস থেকে; যেমন, ক্ষুদ্রকারের স্বনির্ভর প্রকল্প, বেতন- ভিত্তিক চাকরি এবং মজুরি শ্রম। দ্বিতীয়, ফার্মের কাজকর্মের যান্ত্রিকিকরণে এবং কর্মধারায় ও ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রয়োগে এবং খাদ্যশস্যের ব্যাপক পরিসরে প্রকারভেদে সংঘটিত নানা পরিবর্তন ফার্মের ক্ষেত্রে পারিবারিক শ্রমকে লাঘব করে দিয়েছে।

১৭৮) তৃতীয়ত, কৃষি সঙ্কটের একটি নতুন এবং গভীর বিষয় হল প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন থেকে আয় উপার্জনের সঙ্কট। গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এই বার্তা দিচ্ছে যে, উদারিকরণ চালুর পরবর্তী সময়ে গরীব ও মাঝারি কৃষকের একটি লক্ষণীয় অংশের ফার্ম থেকে আয় ক্ষয় পেয়েছে। উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক পথ প্রসঙ্গে আলোচনায় মার্কস এবং মার্কসবাদীরা 'সঙ্কট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বিশেষত মূলধন পুনরুৎপাদনের বাধা চিহ্নিতকরণে। গ্রামস্তরে সমীক্ষায় যেভাবে প্রত্যয়পূর্ণতার সাথে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে চাষের কাজে নিযুক্ত গৃহস্থ কৃষক পরিবারসমূহের বিরাট অংশের ফার্ম- অর্থনীতির পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তীব্র প্রতিবন্ধকতা অনুভূত হয়েছে নয়া উদারিকরণজনিত দুস্থতার মধ্যে। (প্যারা ৬৯ থেকে ৭৪)

১৭৯) ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদন বংশ পরম্পরায় মাঝারি এবং গরীব কৃষকদের অসুবিধা সৃষ্টি করে। বর্তমান সরকারের অধীনে তাদের পক্ষে কৃষি থেকে পর্যাপ্ত আয় সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়, যদি না উপকরণের খরচ কমাতে এবং উৎপাদিত ফসলের দাম বাড়াতে রাষ্ট্র

সিদ্ধান্তক্রমে হস্তক্ষেপ করে, গরীবদের বর্ধিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবার ব্যবস্থা করে এবং ফসল তোলার পর মজুত রাখা এবং মার্কেটিং সুবিধা করে দেয়।

১৮০) চতুর্থত, কৃষকশ্রেণীর পৃথকিকরণ প্রক্রিয়া, যা সর্বহারা শ্রেণীতে রূপান্তরণের কাজকে সম্পাদন করে, তা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দ্রুত সংঘটিত হচ্ছে (প্যারা ৭৫ থেকে ৮৪)। সর্বহারাতে রূপান্তরণের কাজটি ঘটছে প্রত্যক্ষ প্রতিকৃষকিকরণের নমুনা হিসেবে, অথাৎ বিরাট অংশের শ্রমিক, গরীব ও মাঝারি কৃষকের জমির কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদান। গ্রাম ভারতে ভূমিহীনতা বৃদ্ধিই হল সর্বহারায় রূপান্তরণে প্রতিফলনের একটি রূপ। সর্বহারার রূপান্তরণের প্রক্রিয়া ভাড়াটে শ্রমিকের বাজারকে প্রসারিত করছে। গরীব এবং মাঝারি কৃষকেরা এখন গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় ফার্মে ও ফার্ম -বর্হিভূত কাজে মজুর হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

১৮১) বর্তমান সময়ে প্রবণতা নতুন এবং জটিল আকার ধারন করেছে (প্যারা ৬৩ থেকে ৬৮)

১৮২) গোষ্ঠীগত পক্ষপাতিত্ব, নিপীড়ন এবং শোষণ ভারতের কৃষি- সম্পর্কিত বিষয়াবলির এক অন্তর্নিহিত অংশ। জাত-বিভেদের ভিত্তিতে নিপীড়নের নিয়মগুলিকে এবং অস্পৃশ্যতাকে এবং বর্ণ ও লিঙ্গ-ভেদের নিয়মগুলিকে ধ্বংস না করে কৃষিসম্বলিত ত্রুটিগুলিকে সমাধান করা যাবে না। গ্রাম ভারতে বিদ্যমান আর্থ- সামাজিক ব্যাধিসমূহ জাতিভেদ এবং অন্যান্য আকারের গোষ্ঠীগত বঞ্চনা ব্যতিরেকে টিকতে পারে না। (প্যারা ৯৩ থেকে ১০৬)।

১৮৩) রিপোর্টে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন গোষ্ঠীতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্ব এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবে এবং তা হবে আপোষহীন, তখন শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে আমাদের একতা গড়ে তুলতে হবে। যখন সামাজিক ভেদাভেদের মধ্যযুগীয় রীতি-নীতির ফলে কোন দেশ ছিন্ন ভিন্ন আকার লাভ করে, তখন একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই জনগণের একতা বিনষ্টকারী শক্তির, যা পরিচিতিসত্তা থেকে উদ্ভূত হয়, তার সত্যিকারের বিকল্প উপস্থিত করতে পারে এবং যুগপৎ সামাজিক বিভেদের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে পারে। (প্যারা ১০৫ এবং ১০৬)।

১৮৪। রিপোর্টটি বিভিন্ন রকমের কাজ থেকে শ্রমিকদের স্থানান্তরে গমনের বিষয়টির উপর যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে চর্চা করেছে। (প্যারা ১০৭ থেকে ১১২)। এই মাইগ্রেশন সামনের বছরগুলিতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

অতএব এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের পার্টির গণসংগঠনগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করতে হবে, স্থানান্তর গমনের মাত্রা এবং অভিমুখ, দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিযায়ী শ্রমিকেরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং মূল বাসস্থানের এলাকায় পরিবারের যে সকল সদস্য রয়েছে, তাদের হাল কি। যাতে তাদের শ্রম এবং জীবিকা সম্পর্কিত দাবিসমূহ সঠিকভাবে

লিপিবদ্ধ করা যায়, এজন্যই তা করতে হবে।

শ্রমিক- কৃষক জোট

১৮৫। কম উৎপাদনের শস্য থেকে আয় এবং বৃহদাকারের প্রলেতারীয়করণের ফল হিসেবে দারিদ্র্যের সমন্বয় আমাদের সামনে গ্রাম ভারতে শ্রমিক - কৃষক জোট গঠনের নতুন সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। (প্যারা ১১৩)।

উদারিকরণের উত্তরপূর্বে অন্যান্য বিষয়সমূহ

১৮৬। ১৯৯১ সাল থেকে এক দীর্ঘ সারির আইন, বিধি, নিয়ম, আদেশ এবং অন্যান্য নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে, যার লক্ষ্য হল গ্রামীণ ধনীচক্রের অনুকূলে এবং বৃহৎ পুঁজিপতি ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী চরগুলির স্বার্থে গ্রাম ভারতের শ্রেণীগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন আনা। এ সকল নীতি প্রণয়নের ফলে, যা ব্যাপক পরিসরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাৎপর্যপূর্ণ অভিক্ষেপন ঘটায়, উদাহরণ স্বরূপ— ঋণ, কৃষিতে অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কৃষিতে বহুজাতিকদের ভূমিকা, জমি ব্যবহার এবং খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এই বিষয়গুলির প্রতিফল রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র, মানবিক কল্যাণকর অন্যান্য সূচকের মধ্যে। এই ইস্যু গুলির কিছু অবতারণা করা হয়েছে এই রিপোর্টে : গ্রামীণ ঋণ। (প্যারা ১১৮ থেকে ১২১), বাণিজ্য উদারিকরণের বিষয়গুলি, প্যারা (১২২ থেকে ১২৬), কর্পোরেট ক্যাপিটেল, কৃষি এবং সরকার (প্যারা ১২৭ থেকে ১৩২), খাদ্য নিরাপত্তা (প্যারা ১৩৩ থেকে ১৩৮), সরকারি প্রকল্পসমূহ (প্যারা ১৩৯), কর্পোরেট এবং অন্যান্য উদ্যোগসমূহ (প্যারা ১৪০), আয় দারিদ্র্য (প্যারা ১৪১ থেকে ১৪৩), শিক্ষা (প্যারা ১৪৪ থেকে ১৫০), স্বাস্থ্য (প্যারা ১৫১- ১৫৪), গৃহস্থালির সুবিধাসমূহ (প্যারা ১৫৫-১৫৬), এবং জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি এবং গ্রামীণ বিপর্যয় প্রতিরোধ (প্যারা ১৫৭- ১৬৬)।

১৮৭। ভবিষ্যতের উন্নয়ন এবং বৃদ্ধির জন্য এবং আমাদের পার্টির গ্রাম ভারতে অগ্রগতির জন্য গ্রামাঞ্চলের বিষয়গত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আমাদের সংগ্রামের রূপরেখা রচিত হবে। এই বোঝাপড়ার ভিত্তি হবে, অংশ বিশেষে, গ্রাম এলাকার উৎপাদনশক্তির সুনির্দিষ্ট এবং বিষয়গত সমীক্ষা, গ্রামীণ সামাজিক - অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহের এবং সামাজিক গ্রুপগুলির বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন, এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন। এই রিপোর্টটি ঐ অভিমুখে অতিক্ষুদ্র পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়াস নিয়েছে।